সুনামগঞ্জ জেলা

প্রথম দফা প্রতিশোধ নেয়

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে পাঞ্জাবিরা সুনামগঞ্জ শহরে ঢোকে। সুনামগঞ্জের এসডিও ছিলেন পশ্চিমাদের সমর্থক। তাই তার সহযোগিতায় পাঞ্জাবি সেনারা শহরের ডাকবাংলোয় আশ্রয় নেয়। পরদিন সকাল থেকে মেশিনগানের গুলির শব্দে সবার ঘুম ভেঙে যায়। সুনামগঞ্জের সচেতন মুক্তিকামী জনতা এক হতে শুরু করে এবং মুহূর্তের মধ্যেই ঘেরাও করে ফেলে ডাকবাংলোর চারদিক। যার যা ছিল তাই নিয়ে শুরু হলো আক্রমণ। কিন্তু পাঞ্জাবিদের উন্নত অস্ত্রের মোকাবেলা করা খুবই কঠিন। সারাদিন সারারাত টানা গুলিবর্ষণের পর গভীর রাতে কয়েকজন পাঞ্জাবি পালিয়ে যায় এবং কয়েকজনকে সুনামগঞ্জের জনতা হত্যা করে প্রথম দফা প্রতিশোধ নেয়।

পরবর্তীকালে এপ্রিল মাসের শেষ দিকে হঠাৎ একদিন সকাল দশটার দিকে দুটি বিমান শহরের তৎকালীন ইপিআর ক্যাম্পে উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ করে ঢাকায় ফিরে যায়। সেদিন আমার দাদু আর ঠাকুমা বাবা কাকাদের নিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। তখন আমার বাবা সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। গ্রামে গিয়েও তাদের শান্তিতে থাকতে দিল না পাশ্ববর্তি গ্রামের পশ্চিমাদের দোসররা। প্রথম দিনেই ওরা আমাদের ২৬টা গরু বাছুর জোর করে নিয়ে গেল। পরদিন সন্ধ্যায় অন্যান্য গ্রামের কিছু দুষ্ট লোক মিলিত হয়ে সারা গ্রামে আক্রমণ করে লাঠিসোটা নিয়ে। প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে গ্রামবাসীদের গোলা থেকে ধান, চাল ইত্যাদি নেওয়া শুরু করে। দুই দিন পর্যন্ত এই লুটের কাজ চলে। তারা ধান-চাল ও অন্যান্য জিনিসপত্রসহ আসবাবপত্র এমনকি চালের টিনও খুলে নিয়ে যায়। আমাদের গ্রামটি ছিল ১০০ ভাগ হিন্দু অধ্যুষিত। শহরে এসে এমন কাউকে পাওয়া গেল না অভিযোগ জানানোর। তাই বাধ্য হয়ে সুরমা নদী পাড়ি দিয়ে ভারতের বালাট শরণার্থী ক্যাম্পে আমার দাদু পরিবারবর্গকে রেখে ফিরে আসলেন সুনামগঞ্জে। তখনও পাঞ্জাবি সেনাদের দখলে যায়নি সুনামগঞ্জ। হঠাৎ মে মাসে পাঞ্জাবিরা দখল করে নেয় সুনামগঞ্জ শহর। কিন্তু শহরকে মুক্ত করার জন্য দফায় দফায় যুদ্ধ করে ভারত থেকে স্বল্প ট্রেনিং নেওয়া মুক্তিযোদ্ধারা। বেড়ীগাঁও, কাকইগড়া, অক্ষয়নগরে অস্থায়ী ক্যাম্প করে তারা। এভাবে দীর্ঘ নয় মাস পর ১৬ ডিসেম্বর সারা দেশের সাথে সুনামগঞ্জ শহরও মুক্ত হয়ে যায়। তখন আমার দাদুর ঠাকুরমারা, আমার বাবা কাকারা শহরের বাসায় ফিরে এসে দেখেন শুধু একটি ঘর আছে তাও দরজা-জানালা সব খুলে নিয়ে গেছে। পরিবারের সবাই এসে আশ্রয় নেন সেখানে। অনেক দুঃখের মাঝেও এখন তারা সুখী যে, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে আমরা বাস করছি।

সূত্রঃ জ-৬৬২৭

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মনোজ পাল দিপ্ত	**মনোরঞ্জন পাল**
বুলচান্দ উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : বাবা
৭ম শ্রেণি, রোল : ২০	বয়স : ৫০ বছর

একটি মেয়েকে টেনে ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে

যখন পাঞ্জাবি আসে তখন আমার দাদা ছিলেন ভাওয়ালে। সেখান থেকে জানতে পারেন যে সুনামগঞ্জের উত্তরে হালুয়ারঘাট বাজারে এসেছে পাঞ্জাবিরা। তখন হালুয়ারঘাট বাজারে এসে নদী পার হয়ে বাড়িতে। পরদিন আটটার দিকে আমার দাদা সুনামগঞ্জ বাজারে গিয়ে দেখেন যে, দুটি কাপড়ের দোকানে পাঞ্জাবি ঢুকে ভেতরের সব কাপড় বাইরে ফেলে দিচ্ছে। জনগণ সেই কাপড় যে যা পারে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন এসব দেখে দাদা বাড়িতে এলেন কিন্তু নিজেএকখানা কাপড়ও আনলেন না। তারপর পাঞ্জাবিদের ভয়ে গ্রামের লোকজন ভারতে পালিয়ে যায়।

পাঞ্জাবিরা রাজাকারদের সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করল। মুক্তিবাহিনী রাতে এসে আবার রাতেই চলে যেত। মাইজবাড়ী গ্রামে আবার বড় বড় দালাল হয়েছে। পাঞ্জাবিরা যা লুটপাট করত তা দালালের মধ্যে বিলিয়ে দিত। সন্ধ্যা হলে তারা মাইজবাড়ী গ্রামের উত্তর দিক বাঘমারা থেকে গুলি ছুড়ত। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা মাইজবাড়ী গ্রাম থেকে বাঘমারা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ত।

দাদার পরিবারে ছিল দশজন মানুষ। তাদের ছিল খুব খাদ্যাভাব । কাজ না করায় অর্থাভাবে খাদ্য জোগাড় করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। দাদা তখন নিরুপায় হয়ে সুনামগঞ্জ শহরের দিকে কাজের জন্য রওয়ানা হলেন। সাথে নিলেন কাজ করার সকল সরঞ্জাম। পাঞ্জাবির হেডকে তিনি বললেন, আমাদের কিছু কাজ দেন। তখন সে একটি ঘরের দরজা-জানালা ভেঙে ফেলার জন্য নির্দেশ দিল। আরও বলল, এসব কাজ তোমরা দুইজনে প্রতি দিন এসে করবে। এই দরজা-জানালার কব্জা নাট স্ক্রু এসব এক জায়গায় জমা করে রাখবে। কাজ সেরে বাড়িতে আসার সময় প্রত্যেককে রোজ পাঁচ টাকা করে দুইজনকে দশ টাকা মজুরি দেয়। পাঞ্জাবিরা একদিন দাদা ও দাদার সাথের জনকে বলে যে, তোমরা গর্ত কর। ওই দিন তারা গর্ত খোঁড়ে।

শহরে গিয়ে হেডকে বললেন, আপনার লোকজন কাজে আসতে দেয় না। আপনি যদি কার্ড দেন তাহলে আমরা প্রতি দিন কাজে আসব। তখন হেড তাদের দুটা কার্ড দিল এবং বলে দিল যে, কেউ যদি তোমাদেরকে আটকিয়ে রাখে তাহলে এই কার্ড দেখাবে।এভাবে কাজ করে হেডের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজার খরচ করে বাড়িতে নিয়ে আসতো। প্রায় ৬ মাস চলে গেল। অগ্রহায়ণ মাস এল খেতে ধান পেকেছে। দাদা পাঁচ জন কামলা নিয়ে ধান কাটতে গেলেন। পথে পাঞ্জাবিরা আটকায়। আমার দাদা বললেন, আমরা ধান কাটতে যাব। সে যেতে দেয়। পথে এক রাজাকারের সঙ্গে দাদার দেখা হয়। রাজাকার বলে, তোমাদের গর্ত খুঁড়তে যেতে হবে। তখন দাদা বলেন, আমরা যেতে পারব না। ধান না কাটলে খাব কি? রাজকার তখন বন্দুক তুলে ধমক দিয়ে বলে যে, সে পাঞ্জাবিকে ডেকে আনবে। এই কথা শুনে দাদারা দৌড়িয়ে গ্রামের ভেতর ঢুকে লুকিয়ে গেলেন। সেই দিন আর ধান কাটতে গেলেন না। পরদিন সুরমা নদী পার হয়ে ওপারে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন কোনো লোকজন নেই, শুধু পাঞ্জাবি। তখন কি করবেন ? দাদা হাঁটতে হাঁটতে মাগেরগাঁও গেলেন। সেখানে গিয়ে ধান কাটতে লাগলেন। প্রায় আধাঘণ্টা পরে পাঞ্জাবি এলো। মানুষ ছিল তারা ছয়জন। একজন পাঞ্জাবি তিনজনকে মুক্তির গর্ত ভেঙে ফেলার জন্য নিয়ে গেল। গর্ত ভাঙতে শুরু করল। তারপর আবার কত সময় পরে একজন পাঞ্জাবি আসল। এসে আরো দুইজনকে নিয়ে গেল। এদিকে দাদা ও তার সাথের জন পুনরায় ধান কাটতে শুরু করল। একজন পাঞ্জাবি এল। আমার দাদাকে বলে চাদর। দাদা বলেন, আমার সঙ্গে কোনো টাকা-পয়সা নেই। দাদার সাথে যে লোকটি ছিল তাকে বলে কিনে দিতে ওই চাদর কিন্তা হে। সেই লোকটি বলে, আগামীকাল টাকা নিয়ে আসব। চাদরের দাম কত? পাঞ্জাবিরা কঞ্চি দিয়ে সেই লোকটিকে খুব মারপিট করল। পরে সেই তার মাথায় চাদর বেঁধে ক্যাম্পে নিয়ে গেল। দাদা একা রইলেন। দশ মিনিট পর আবার একজন এসে দাদাকে বলে, শালা তুই মুক্তিহে? তখন দাদা বললেন, আমি মুক্তি নেহি। তখন দাদাকে বলে, চল ক্যাম্পে। দাদা গিয়ে দেখলেন, শুধু কালো পোশাকের পাঞ্জাবি এবং নানা রকম হাতিয়ার। তারপর সে যেয়ে তার হেডকে বলল, একজন মুক্তি আনিয়াছি। তখন হেড আসিয়া দাদাকে বলল, তুমি কেয়া করতা হে। দাদা বললেন, হাম লোক ধান কাটতা হে। তখন হেড বলে, যাও চলে যাও। তারপর দাদা আগে আগে দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন আর পেছনে পাঞ্জাবিও চলতে লাগল।

অন্য একদিন তিনি দেখেন, কয়েকজন পাঞ্জাবি একজন পুরুষ লোককে দাঁড় করে হত্যা করে একটি মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে তাদের ক্যাম্পের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেই ঘটনার কয়েক দিন পর পাঞ্জাবিরা মুক্তির গর্ত যেখানে ভেঙেছিল সেখানে দাদাকে নিয়ে গেল। দাদার সঙ্গে যতজন কামলা ছিল সবাইকে বলল, গর্ত শেষ করো। তখন পাঞ্জাবি বলে, আমার সঙ্গে সবাই আসো। তারপর যেখানে গর্ত ভেঙেছিল এবং খাল পেরিয়ে ধানের ভেড়িতে নিয়ে বলল. তোমরা যে যা পার তা নাও। তখন তারা ছয়জন ছয় ডোলা ধান মাথায় নিয়ে বাড়িতে চলে আসলেন। নদীর সেই পাড়ে তারা আর কোনোদিন যাননি।

এদিকে আমার দাদা ও তার সাথের পাঁচজন লোক বাড়িতে এসে দেখেন যে পাঞ্জাবি তাদের বাড়ির একজনকে হত্যা করে চলে গেছে। এতে তারা সবাই শোকাহত হলেন এবং এভাবে নয়টি মাস কাটার পর হঠাৎ শুনতে পেলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের এ দেশ থেকে পালিয়েছে। তখন দাদা সুনামগঞ্জ শহরের দিকে রওয়ানা হলেন। থানার সামনে গিয়ে দেখেন এক পাঞ্জাবিকে লোকেরা হাওরের মাঝ দিয়ে দাবড়িয়ে ধরে মেরে ফেললো।

সূত্র: জ-৬৬৩১

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মো. আজাদ মিয়া	**মো. আব্দুল আহাদ**

বুলচান্দ উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : দাদা
৯ম শ্রেণি, রোল : ১৮	

সব মুরগি নিয়ে গেল

সুনামগঞ্জে যখন পাকিস্তানি মিলিটারি এসেছিল তখন আমার দাদু এবং দিদি দৌড়ে হরিনগর গিয়েছিলেন। সেখানে তারা দুইদিন থাকেন। আবার তারা সুনামগঞ্জে ফিরে আসেন। দুই দিন থেকে সুনামগঞ্জ থেকে বালাট ক্যাম্পে চলে যান। বালাট ক্যাম্প থেকে তাদেরকে চিনি, তেজপাতা, কেরোসিন, পিঁয়াজ-রসুন, ডাল ইত্যাদি দেয়। তাদেরকে কাপড়-চোপড়ও দেয়। বালাট ক্যাম্পে আমার দাদু ও দিদাকে মাচাং বাড়ি বানিয়ে দেয়। একটি রেশন কার্ড দেয়। আমার দাদু লাইনে দাঁড়িয়ে কার্ড দেখিয়ে রেশন আনতেন।

সেই এলাকার মানুষ কাঁঠাল খেত না। দিদার কাছ থেকে ৩০০ টাকা নিয়ে বাংলাবাজার থেকে দাদু দেড়শটি মুরগি কিনেছিলেন। একটি মুরগি তিনি সাড়ে তিন টাকায় বিক্রি করতেন। তার কিছু টাকা লাভ হয়। তিনি দিদার ৩০০ টাকা ফিরিয়ে দেন। লাভের টাকা দিয়ে আরো দেড়শটি মুরগি আনেন। বাংলাবাজার থেকে মুরগি নিয়ে আসার সময় বৃষ্টি নামে। দাদুর এক বন্ধু তখন ছাতা নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে বন্ধু ডাক দিলেন। তিনি বললেন, তুই তোর একটা মুরগি বিক্রি করে দে। তারপরে আমরা দুইজনে চলে যাব।

তখন এক খাসিয়া তাকে ডাক দিল, দাদু বন্ধুসহ সেখানে গেলেন। দামাদামিতে মুরগি বিক্রি করা হল না। আর একজন মহিলা খাসিয়া তাকে ডাক দিলেন। বললেন যে এদিকে এসো। তখন তারা সেখানে গেলেন। এক সিপাই পুলিশ সেখানে এল। তিনি আমার দাদুর বন্ধুকে সেই মুরগি দিয়ে মারতে লাগল। শেষ পর্যন্ত মারতে মারতে মুরগির দুই ঠ্যাঙ ভেঙে হাতে এল। তারপর সেই পুলিশটা বাড়ির পেছনে গিয়ে বড় একটা বুট জুতা আনলেন। আমার দাদুকে বললেন, এটা কী? দাদু বললেন, এটা বুট জুতা। আবার একটি গুলির বাক্স আনলেন। বললেন, এটা কী? দাদু বললেন, গুলির বাক্স। পুলিশটা বললেন, এই বাক্সে মুরগি রাখ। তারপর দাদুর সব মুরগি নিয়ে চলে গেল পুলিশটা।

সূত্র: জ-৬৬৩৩

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
ইমন তালুকদার	**পীযূষ বণিক**
বুলচান্দ উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৬৮ বছর
৭ম শ্রেণি, রোল : ০১	

সম্পূর্ণ দায়ী ছিল পশ্চিম পাকিস্তান

আমার নাম লাবণ্য বালা পাল। আমার স্বামীর নাম বিনন্দ চন্দ্র পাল। আমার তিন ছেলে এবং চার মেয়ে নিয়ে। যুদ্ধ চলাকালীন আমি সুনামগঞ্জ জেলার লালরচর গ্রামে বসবাস করতাম। যখন যুদ্ধ চলছিল তখন আমার খুবই ভয় লাগত।

আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কাঁচা রাস্তা। যখন কোনো গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে যেত তখন আমরা খুবই ভয় পেতাম। সুনামগঞ্জ জেলায় পাঞ্জাবিরা এসে নানা রকম অত্যাচার শুরু করল। তারা বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ করতে লাগল। তখন ভয়ে মানুষ দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা ভারতে চলে যাই। তখন এ দেশ থেকে পালানো ছিল খুবই কঠিন। আমি আমার এক মেয়েকে আরেকজনের সাথে দিয়ে দিই। ভারতের বালাট নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করি।

সে সময় চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত ছিল না। অনেক অভাব ছিল আমাদের। সেখানে আমার স্বামীর ডায়রিয়া হয়। সেই সাথে আমার এক মেয়ে এই রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু অনেক ওষুধ খাওয়ার পরও রোগের কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি। যার ফলে আমার স্বামী ও মেয়ে মৃত্যুবরণ করে। যুদ্ধ না হলে আমার স্বামী ও মেয়ে আরও অনেক দিন বেঁচে থাকত। পশ্চিম পাকিস্তান যদি আমাদের ওপর এ রকম জুলুম না করত তাহলে আমাদের দেশ ত্যাগ করতে হতো না এবং স্বামী ও মেয়ে করুণভাবে মৃত্যুবরণ করত না। স্বামী ও মেয়ে

হারানোর পর বাকি সন্তানদের নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসি স্বাধীন হওয়ার পর। বাংলাদেশে আসার পর আমার আমার বড় ছেলে নিউমোনিয়া অসুখে মৃত্যুবরণ করে।

সূত্রঃ জ-৬৬৪২

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
প্রসেনজিৎ চন্দ্র পাল	**লাবণ্য পাল**
বুলচান্দ উচ্চ বিদ্যালয়	
১০ম শ্রেণি, রোল : ০২	

কলাপাতা দিয়ে দাফন

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে হানাদার বাহিনী অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল অগণিত মানুষকে। আমার বাবা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। দোকানে বসে তিনি অনুমান করছিলেন যে, এই হানাদার বাহিনী একটি মানুষকেও ছাড়বে না। এপ্রিল মাসের পাঁচ-ছয় তারিখে ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর সেনাবাহিনীর দশ-বারোজন সদস্য ছাতকে এসে জড়ো হলেন। আমার বাবা দোকান থেকে উঠে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বাবার সঙ্গে ছিল পিয়ারা মিয়া, কবির মিয়া, সিরাজ এবং আরো অনেকে।

লামাকাজী ঘাটে তিনটা ফেরি ছিল। যা দিয়ে পাকহানাদাররা তাদের গাড়ি পার করত। ৯ এপ্রিল রাতে আমার বাবা এবং আরও অনেকে মিলে সেই ফেরি ডুবিয়ে দিলেন। তখন হানাদার বাহিনীর গাড়ি আর এই পারে আসতে পারল না। এপ্রিলের ২৭ তারিখ পর্যন্ত ছাতক ছিল মুক্ত ও নিরাপদ। ২৮ তারিখে হানাদার বাহিনী তিন দিক দিয়ে ছাতক আক্রমণ করে। রেলওয়ে, সিঅ্যান্ডবি রোড, নদীপথ এই তিন দিক থেকে ওদের অভিযান শুরু হয়। ছাতক রেলস্টেশনে আমার বাবা ডিফেন্স নেয়। তখন পাকহানাদার বাহিনীর সাথে গোলাগুলি শুরু হয়েছে। গোলাগুলি শেষ করে আমার বাবা ফকিটিলা ইপিআর ক্যাম্পে জড়ো হলেন। ছাতক বাজার এবং বাগবাড়ি গ্রামের অনেক লোক মারা গিয়েছিল। যখন পরিস্থিতি খুবই খারাপ দেখলেন তখন আমার মা ও দাদা-দাদি চলে যান ভোলাগঞ্জে। তারপর চলে যান ভারতে। আমার বাবা ভারতে যাওয়ার পর আমার নানা (আব্দুলাহ বারী) এসে মাকে ঘারগাঁও মাধবপুর গ্রামে আমার মামার বাড়িতে নিয়ে যান ।

আমার বাবা ভারতে রয়েছেন এই খবর পাকহানাদার বাহিনী পেয়ে যায়। তখন তারা আমার দাদা আব্দুল গনিকে পাঠিয়ে দেয় বাবাকে নিয়ে আসার জন্য। দাদা আমার বাবার কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলেন, পাকহানাদার বাহিনী আমাকে পাঠিয়ে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। উত্তরে আমার বাবা বলেন, কেঁদো না বাবা, আমার কিছুই হবে না। তখন আমার দাদা বাবাকে বলেন, তুমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাও। আমি পাকবাহিনীকে গিয়ে বলব তোমাকে খুঁজে পাইনি। ওরা তোমাকে পেলে মেরে ফেলবে। আমার বাবা এ কথার জবাবে বলেন, ওরা যেভাবে আমাদের দেশের মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে আমরা সবাই প্রতিশোধ নেব এবং জয়ী হয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনব। আমি এখানে এসেছি নিজেকে রক্ষা এবং দেশকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে। দাদার কাছ থেকে তিনি খবর পেলেন মা নানাবাড়িতে আছেন।

দাদা বাড়িতে ফিরে এলেন। তারপর পাকবাহিনীরকে বললেন, আমি ওকে খুঁজে পাইনি। বাবাকে না পেয়ে সোনালী ব্যাংকের সামনে আমার বাবার একটি দোকান ছিল, যা রাজাকার আর পাকহানাদার মিলে লুটপাট করে ভেঙে দিল। বাবা ভারতে কয়েক দিন অবস্থান করে ভোলাগঞ্জে চলে আসেন। ভোলাগঞ্জ থেকে আমার নানাবাড়ি আসেন ঘারগাঁও মাধবপুর মায়ের সাথে দেখা করার জন্য। তারপর সেখান থেকে নানা-নানী এবং মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভোলাগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় ঘারগাঁও, মাধবপুর গ্রামের রেললাইনে ট্রেন উড়ানোর জন্যে একটি মাইন ফিট করলেন। যাওয়ার পথে তাজপুর রেললাইন ডেমোলিশন দিয়ে উড়িয়ে দিলেন।

৫ নং সাব-সেক্টর ভোলাগঞ্জে আমার বাবা অবস্থান করেছিলেন। কমান্ডে ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। ১নং আলফা কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন ফখর উদ্দিন চৌধুরী। ফখর উদ্দিন কমান্ডারের কমান্ডে টুকর বাজারে অপারেশন হয়েছে। সেখানে ফিরোজ নামে একটি ছেলে মারা গেল। দাফনের কাপড় না পেয়ে কলাপাতা দিয়ে তাকে দাফন করা হয়েছে। তারপর তেলিখালে পাকহানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে মোস্তফা নামে

একজন মারা গেল। তার লাশ বাবাসহ অন্যরা বহু চেষ্টা করেও আনতে পারেননি। অনেকে আহত হয়েছে এবং আমার বাবাসহ চারজন সাঁতার কেটে ভোরে বাটরাই গ্রামের সিফত উলার বাড়িতে কোন ভাবে এসে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন।

নুরুল হক জুলিয়েট কোম্পানির কমান্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ৫নং সাব সেক্টর শলায় যান তারা। এবং মাজারগাঁও খালে অনেক মিলিশিয়া ও রাজাকারদের সাথে তাদের গোলাগুলি হয়। ১৪ আগস্ট ছাতকে রেলওয়ে সার্কিট হাউসে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিলেন মুক্তিযোদ্ধারা।

সূত্র: জ-৭০৮৮

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
গুলনাহার আক্তার মিমু	**আলহাজ্ব নিজাম উদ্দিন (মুক্তিযোদ্ধা)**
চন্দ্রনাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: বাগবাড়ী
নবম শ্রেণি, মানবিক বিভাগ, রোল : ৩০	বয়স : ৬০, সম্পর্ক : বাবা

এগার জনকে জীবিত পুঁতে ফেলে

২৫ মার্চ ১৯৭১, পাকিস্তানি সেনাদের সশস্ত্র হামলার খবর আসার সাথে সাথেই ছাতকে প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা শুরু হয়। সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন চলার সময় শিল্পনগরী ছাতকেও অসহযোগ আন্দোলন কার্যকরভাবে চলছিল। নবনির্বাচিত এম এন এ আব্দুল হকের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটির কাজ পরিচালিত হয়। ২৮ এপ্রিল পাকবাহিনী ছাতকে আসে। নৃশংসভাবে হত্যা করে পল্লীকবি উছমান গনিসহ আরো কয়েকজনকে। ছাতক, সুনামগঞ্জ, সিলেট ও কিশোরগঞ্জ এই চারটি গ্রুপ একত্রিত হয় ট্রেনিংয়ের জন্য। ২৮ দিনের প্রশিক্ষণের পর এদের তিন ভাগে ভাগ করে বালাট, সেলা ও ভোলাগঞ্জে পাঠানো হয়।

মুক্তিবাহিনী ছাতকে আসে ১৩ অক্টোবর। যুদ্ধ শুরু হয় সেদিন থেকেই এবং শেষ হয় ১৭ অক্টোবর। এ যুদ্ধে প্রায় ৭০-৮০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পাকবাহিনী ছাতকে আসার পর অনেকেই তাদের নৃশংসতার সহযোগী হিসেবে কাজ করে। আবার অনেকে জনগণকে সাহায্য করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম বেলায়েত আলী। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পথে কিছুসংখ্যক দালাল ১৮জন যুবককে পাঞ্জাবিদের হাতে তুলে দেয়। পাঞ্জাবিরা তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। এদের মধ্যে ১১ জনকে জীবিত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলে। সাত ডিসেম্বর ছাতক পুরোপুরিভাবে পাকহানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হয়। আট ডিসেম্বর ছাতকে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়ী জনতার সমাবেশ।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমার বাবা প্রথম দিকে গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। মাঝামাঝি সময়ে ক্যাম্পে চলে যান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাবা যখন ছাতক আসেন তখন তিনি এখানকার স্থানীয় লোকের মুখে এসব ঘটনা শোনেন। বাবা যখন গ্রামের বাড়ি ও ক্যাম্পে ছিলেন তখন তিনি অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার মা ছিলেন নববধূ। তাদের বিয়ে হয় ২০ মার্চ ১৯৭১ সালে। যুদ্ধের প্রথম পাঁচ মাস আমাদের গ্রামের বাড়ি মৌলভীবাজার থানার খলিলপুর গ্রামে তারা ছিলেন। পাশেই কুশিয়ারা নদী। নদীর উত্তরে মুক্তিবাহিনী এবং দক্ষিণে পাকবাহিনী। এগুলো মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকের ঘটনা। তখন পাকবাহিনী তাদের ফাইটার প্লেন নিয়ে আসে। অনেকবার আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে ফাইটার প্লেন উড়ে গেছে। নদীর তীরের যুদ্ধে পাকবাহিনী জিতে গেল। খলিলপুর গ্রাম তাদের দখলে চলে আসে। অনেকেই তখন পাকিস্তানিদের সাহায্য করতে শুরু করে। শুরু হয় গ্রামে অত্যাচার আর লুণ্ঠন। তখন আমার দাদু ও ঠাকুরমার অনুরোধে বাবা-মা, সেজ কাকু, সেজ মামা ও বড় মামাকে সাথে নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে শরণার্থী ক্যাম্পে যান। বাড়িতে থাকেন দাদু, ঠাকুমা, ছোট কাকু ও আরো একটি আমাদের আত্মীয় পরিবার।

তারা নৌকা দিয়ে ক্যাম্পে গিয়েছিলেন। যে নদী দিয়ে গিয়েছিলেন সে নদী দিয়ে পাকবাহিনী প্রায়ই যেত-আসত। ভয়ে তারা এক গ্রামে ৭-৮ দিন ছিলেন। সাহস করে একদিন রওনা করলেন। তাদের সাথে আরো অনেকেই ছিল। তাদের নৌকা সবার আগে ছিল। কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তাদের নৌকা পাকবাহিনীর সামনে

গিয়ে পড়ে। পাকবাহিনীর বোটে বন্দুক তাক করানো ছিল। কিছুদিন আগেও এই নদী দিয়ে যাওয়ার সময় পাকবাহিনী গুলি করে মেরে ফেলেছে অনেককে। কিন্তু তারা কিভাবে যে বেঁচে গেলেন তারা নিজেও জানেন না। বাবা বাঁচার আসা ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ছিলেন। নৌকার মাঝি পাকবাহিনীর সামনা সামনি হতে না হতেই নৌকা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। তারা এক গ্রামে গিয়ে উঠেন। তাদের কেউ জায়গা দিতে চাচ্ছিল না। এক মহিলা বলেছিল, 'এখান থেকে চলে যাও না হলে এখানেও পাক হানাদাররা চলে আসবে।' তারা এক বাড়ির বারান্দায় উঠে বসেন। কিছুক্ষণ পরে তারা রওনা দেন। এবং বালাট ক্যাম্পে যান।

সেখানে গিয়েও সমস্যা। প্রতিদিন কলেরায় লোক মারা যেতে থাকে। আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় ৫০হাজার ছিল। একদিন ঘোষণা করা হয় যে কলেরায় ৯৩৬ জন মারা গেছে। স্নান করতে গেলে নদীর চরায় দেখা যায় লাশ ভাসছে। পোড়ানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না বলে হিন্দুদেরকেও মাটিতে কবর দেওয়া হতো। আর একটু বৃষ্টি হলেই লাশের হাত-পা মাটির উপর ভেসে উঠত। আমার সেজ মামা কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাবা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। দুদিন পর তিনি আস্তে আস্তে সুস্থ হতে লাগলেন। তিনিও বেঁচে গেলেন মৃত্যুর মুখ থেকে। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো, বাড়িতে আমার বাবার দাদু মারা যান পাকবাহিনীর গুলিতে। তার লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল সেই সময়ে আর সেটা হলো, আমার মায়ের মা-বাবা থাকতেন কিশোরগঞ্জে। একদিন সন্ধ্যায় দিদিমা ঠাকুর প্রণাম করছেন। প্রণাম করে মাথা তুলেই দেখেন পাক সেনারা সম্পূর্ণ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। আমার দিদিমার স্বভাব ছিল কিছু হলেই হায় সর্বনাশ বলেই মাথায় হাত দিতেন। সেদিনও পাকরা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে দেখে তিনি হায় সর্বনাশ বলে মাথায় হাত দেন। আর পাকরা মনে করে তিনি তাদের সালাম করছেন। সেই ভেবে তারা সেদিন খুশী হয়ে চলে যায়। আমার দাদু দিদিমা এখনো বেঁচে আছেন। এই ঘটনাগুলোই আমি আমার বাবার মুখে শুনেছি।

সূত্র: জ-৭১০৪

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
স্বর্ণা চক্রবর্তী	**গৌরাঙ্গ কুমার চক্রবর্তী**
চন্দ্রনাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : বাবা, বয়স : ৬০
নবম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ০২	

শিখা সতেরো

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সম্ভবত আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। ছাতকের বেতুরা গ্রামে চেয়ারম্যান (ফকির নামে পরিচিত)-এর বাড়িতে রাতে ১৭-১৮ জন যুবক আশ্রয় নেয়। চেয়ারম্যান রাতে খাওয়া-দাওয়া করানোর পর তাদের ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দেন। মুক্তি ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়লে চেয়ারম্যান বাইরে থেকে দরজায় শিকল দিয়ে তাদের আটকে রাখেন। অন্যদিকে রাজাকার নেতা ফকির চেয়ারম্যান রাতেই দুরভিসন্ধি করে পাকবাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এই বলে সংবাদ দেন যে, আমার বাড়ির বাংলোঘরে মুক্তি সেনা আটকিয়েছি, আপনারা আসেন। পরদিন সকালে পাকবাহিনী আসে এবং তাদের ধরে নিয়ে লঞ্চযোগে ছাতকে নিয়ে এসে মাধবপুর গ্রামের নিকটবর্তী জায়গায় ১৭ জন মুক্তিসেনাকে একই গর্তে ঢুকিয়ে গুলি করে হত্যা করে এবং একই কবরে কবরস্থ করে। তাদের মধ্যে জাফর নামে একটি ছেলে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। তাঁর বাবার নাম ছিল আব্দুর রউফ মাস্টার (গ্রাম: ছাতক বাজার)।

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সেই জাফর একদিন ফকির চেয়ারম্যানকে ছাতক বাজারে আক্রমণ করে। তখন রাজাকারদের অনেক কুচক্রী ঘটনা শোনা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই রাজারের কোনো বিচার হয়নি। এই ১৭ মুক্তিসেনার মৃত্যুর ঘটনাকে স্মৃতি হিসেবে ধরে রাখার জন্য ছাতকের মাধবপুরস্থ গ্রামের পাশে স্মৃতিসৌধ হিসেবে 'শিখা সতেরো' স্থাপন করা হয়। যা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বহন করে আছে। মুক্তিযুদ্ধের এটি একটি সত্য ঘটনা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই 'শিখা সতেরোতে মুক্তিসেনাদের নামফলক স্থাপন করা হয়নি ও শহীদ মিনারের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। অচিরেই এটাকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি দিয়ে পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা আবশ্যক।

সূত্র: জ-৭১১০

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
নুসরাত জেরিন লিমা	**আবুল বশর**
চন্দ্রনাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সিনিয়র শিক্ষক
নবম শ্রেণি	চন্দ্রনাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ছাতক
	বয়স : ৫০, সম্পর্ক : চাচা

পড়ে রইল দাদুর লাশ

১৯৭১ সাল। সারা দেশে চলছে মুক্তিযুদ্ধ। সিলেটের ছাতক থানার বাগবাড়ী গ্রামে ছিলেন কুমুদ রঞ্জন দাস ও তার স্ত্রী মানদা রানী দাস। তাদের ছিল পাঁচটি মেয়ে একটি ছেলে। ছেলেটি সবার ছোট নাম কৃপাংশু দাস নারায়ণ। তিনি আমার বাবা। ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখেই ছিলেন তিনি। ছেলে নারায়ণকে খুব ভালোবাসতেন। একদিন বাবা ও ছেলে সিলেট এলেন এবং দেখলেন যে সেখানকার অবস্থা খুব খারাপ। দিকে দিকে হরতাল, মিছিল, খুন, রাহাজানি, ইত্যাদি। রাতে রেডিওতে শুনলেন যে, পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার সৈন্য আসছে। ভীত হয়ে তিনি সন্তানদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ভারত পাঠিয়ে দেন। সেদিন তিনি সকালে বাজারে গিয়ে ইলিশ মাছ কিনে আনলেন দুপুরে খাবেন বলে। আমার দাদু আমার বাবাকে নিয়ে চুল কাটাতে গেলেন। তখন প্রায় দুপুর। হঠাৎ শোনা গেল গোলাগুলির শব্দ। তখন তারা দেখলেন যে হাতে বন্দুক নিয়ে মিলিটারি বাজারের দিকে আসছে। মানুষ তখন প্রাণের ভয়ে ছুটছে। তারাও ছুটতে ছুটতে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছু দূর এসে পেপার মিল হয়ে বাড়িতে এলেন। সকলকে বললেন যে মিলিটারি এসেছে। তারা সবাই কাপড়-চোপড় গোছালেন। হঠাৎ টক টক শব্দ শোনা গেল। দেখলেন যে উঠানে মিলিটারি এসে হাজির। সবাই এদিক ওদিক লুকিয়ে গেলেন। দরজায় এসে তারা কড়া নাড়তে লাগল। ভয়ে ভয়ে তিনি দরজা খুললেন। সাথে সাথে তার বুকে একজন মিলিটারী বন্দুক ধরল এবং জিজ্ঞাসা করল তোমহারা নাম কিয়াহে ? তখন আমার দাদু বলেন, আমার নাম কুমুদ রঞ্জন দাস। তখন তাকে তারা বলে, চাল হামারা সাথ। তখন তাকে সাথে নিয়ে তারা চলে গেল এবং দুই-তিন জন রয়ে গেল বাড়ি পাহারায়। তারা বাগবাড়ীর মাদ্রাসা মার্কেটের পেছনে ময়না মিয়া হাজির বাড়িতে গেল এবং প্রথমে তাকে মারল পরে মারল তার ছেলে সমুজ মিয়াকে। তারপর আমার দাদুকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলো উঠানে দাঁড় করিয়ে রাখল। কিছুক্ষণ পর তারা তাদের বন্দুক খাড়া করল এবং হঠাৎ আমার দাদুকে গুলি করল। একসাথে ১৮ রাউন্ড গুলি। আমার বাবা তখন চিৎকার করে বলেন, বাবা ! সাথে সাথে আমার ঠাকুরমা তার মুখ চেপে ধরলেন। মিলিটারি যখন বাড়ি থেকে চলে গেল তখন তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এবং চারিদিকে কান্নার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। চারদিকে শুধু গুলির শব্দ আর আর্তচিৎকার। নিজের ঘরবাড়ি, দেশের মাটি, টাকা পয়সা, গরু ছাগল সব ফেলে তারা ভারতে চলে গেলেন। তখন আমার বাবার সেকি কান্না আমার ঠাকুরমাকে ধরে। আমার ঠাকুমা তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলেন। আমার দাদুর লাশ বাড়ির উঠানে পড়ে রইল। তারা ভারতের শরনার্থী শিবিরে চলে গেলেন। পড়ে রইল পূণ্য বাড়িঘর আর আমার দাদুর লাশ।

সূত্র: জ-৬৮৫৭

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
সানী দাস	.....
ছাতক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৪৭, সম্পর্ক : বাবা
অষ্টম শ্রেণি, শাখা : খ, রোল : ৩৫	

শুধুই যুদ্ধ আর মৃত্যু

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাকবাহিনী সিলেট থেকে সুরমা নদী দিয়ে লামাকাজী ঘাট অতিক্রম করার চেষ্টা করলে সর্বপ্রথম বাধা পায় ছাতকের আনসার কমান্ডার নুরুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন দলের কাছে। এক দল যুবক নদীর ওপারে পাকবাহিনীকে গুলিবর্ষণ করে। সিলেট শহর থেকে শরণার্থীর ঢল ভোলাগঞ্জ ও মেঘালয়ের শেলা-এর দিকে আসে। এপ্রিল মাসেই পাকবাহিনী ছাতক প্রবেশ করে এবং দিঘলী গ্রামে হত্যা করে জিতেন্দ্র দাসকে। ছাতকে ঢুকে হত্যা করে এম.পি সামছু মিয়ার পিতা, ভাই সবুজ মিয়া ও আরো অনেককে।

মে মাস থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীকে আঘাত হানতে শুরু করে। মে-জুন মাসে দুর্বিন টিলা, হাজার টিলা, পেপার টিলা অপারেশন হয়। সর্বপ্রথম যে বড় অপারেশন হয় তা হলো আগস্ট মাসে ইদ্রিস আলীর নেতৃত্বে। তিনি সাবেক রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির সদস্য ও নৈনগাঁও হাই স্কুলের শিক্ষক। বেতুতার কুখ্যাত ফকির চেয়ারম্যান নিজ বাড়িতে ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে পাকবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেয়। তাদের পাকবাহিনী জীবন্ত কবর দেয় মাধবপুর ব্রিজের নিকট। এই অপারেশনে তার সঙ্গে ছিলেন গিয়াস উদ্দিন, সামাদ, মুছাব্বির, আব্দুল আজিজ ও অন্যান্যরা। ফকিরের বাড়িতে অবস্থানরত পাকবাহিনী পলায়ন করে। মুক্তিযোদ্ধারা ফকিরের বাড়ি ধ্বংস করে। কিন্তু ১৮ আগস্ট পাকবাহিনী রাজাকারদের বিশাল বাহিনী নিয়ে নৈনগাঁও আক্রমণ করে হত্যা করে বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলীসহ আরো ১৯ জনকে। তারা ব্যাপক ধর্ষণ ও লুটতরাজ করে।

১৫ আগস্ট ইদ্রিস কোম্পানী বালিউড়া অপারেশন করে। ১৪ আগস্ট শহিদ কোম্পানী পেপার টিলা অপারেশন করে। ২ সেপ্টেম্বর মহব্বতপুর অপারেশন করে। মুক্তিযোদ্ধারা ওই সময় বেটিরগাঁও, মহব্বতপুর, ভোগলাবাজার, নাসিমপুর প্রভৃতি স্থানে অগ্রসরমাণ পাকবাহিনীকে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে প্রতিহত করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সুরমা নদীর উত্তর তীর মুক্ত ছিল।

গোবিন্দগঞ্জ ও ছাতকের মধ্যে সিলেট-ছাতক রেললাইনে তাজপুর রেলওয়ে সেতু। সেতুটি গুরুত্বপূর্ণ। বাঁশতলা শেলা সাব-সেক্টর থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য নূরুজ্জামান, বুলিমিয়া, পিয়ারমিয়া প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধা হালকা অস্ত্রশস্ত্রসহ নদীপথে রওনা হয়ে পথ হারিয়ে ফেলে। নৈনগাঁওয়ের নিকট অনেক কষ্টে নৌকা বিস্ফোরক বসিয়ে সফলভাবে রেল ওয়ে সেতু উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। মুক্তিসেনারা ফেরার পথে নৈনগাঁওয়ে পাকবাহিনীর সম্মুখীন হয়। সাত ঘণ্টা দীর্ঘ যুদ্ধের পর তারা বালিউড়া পৌঁছে। ছাতক থানার মৌলা, কুপিয়া, হাদা ও পাণ্ডবে মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি গ্রুপ শক্ত অবস্থান নিয়ে টিকে ছিল। পাকবাহিনী ও রাজাকাররা প্রচণ্ড হামলা করেও মুক্তিযোদ্ধাদের ওই অবস্থান থেকে হটাতে পারেনি।

সূত্র: জ-৬৮৯৮

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মো. মুরাদ হোসেন	**মিন্টু**
ছাতক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৫৭
৮ম শ্রেণি, রোল : ২৮	

এ যেন নদী নয় লাশের বধ্যভূমি

তথ্য প্রদানকারী আমার নানা। তিনি দিরাই-শালার মুক্তিযোদ্ধাদের দলপতি ছিলেন। নানার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের যে তথ্য পেয়েছি তা নিচে বর্ণনা করলাম।

সারা দেশের মতো তৎকালীন সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমা (বর্তমান জেলা)তেও মুক্তিযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। দলে দলে মানুষ গ্রামগঞ্জ ও শহর থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে থাকে। ২৭ মার্চ ১৯৭১ সুনামগঞ্জের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। সেদিন দিবাগত রাত হতে পরের দিন পর্যন্ত অবিরাম গুলি চালায় পাক আর্মিরা। তখন মারা যান আনসার কমান্ডার আবুল হোসেন, রিকশা চালক গণেশ এবং নাসের নামের এক ব্যক্তি। এরা হলেন সুনামগঞ্জের প্রথম শহীদ। সেদিন জনতা ও ইপিআরের লোকজন সার্কিট হাউস ঘিরে পাকহানাদারদের আক্রমণ করে। হানাদাররা দুইজন আহত সৈনিককে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। উত্তেজিত

জনতা ও ইপিআররা আহত দুই পাকসৈনিককে গুলি করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এর পরের দিন সুনামগঞ্জে আসে হানাদারদের বিমান হামলা। তখন মারা যান যতীন্দ্র বর্মণ নামের এক ব্যক্তি।

৪ জুলাই ১৯৭১ রাত ৯ টার দিকে সালেহ চৌধুরী, চান্দ মিয়াসহ মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল নৌকাযোগে আখাউড়া গ্রামে অবস্থান নেয়। উদ্দেশ্য শাল্লায় অপারেশন। সালেহ চৌধুরী ও চান্দমিয়া থানার পরিস্থিতি জানার জন্য আখাউড়ার শ্রীকান্তকে ঘুবিয়ারগাঁও পাঠান। শ্রীকান্ত যাওয়ার পর শুরু হয় ঝড় বৃষ্টি। এক পর্যায়ে তারা শ্রীকান্তের ফেরার আশা বাদই দেন। হঠাৎ নৌকার পেছনে একটা ছপ ছপ শব্দ হয়। টর্চ মেরে কিছু দেখা যায় না। তখন একটা কণ্ঠ শোনা যায়, চৌধুরী সাহেব আমি শ্রীকান্ত। কতটুকু গভীর দেশপ্রেম থাকলে একজন মানুষ এরকম দুর্যোগপূর্ণ রাতে প্রায় আড়াই মাইল সাঁতরে আসতে পারে, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু শ্রীকান্ত এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সমস্ত খবর পাওয়ার পর সালেহ চৌধুরী ও চান্দ মিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ভোর ছয়টার দিকে শাল্লা থানা আক্রমণ করেন। ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের সবাইকে বন্দি করে সমস্ত অস্ত্র তাদের দখলে নিয়ে আসেন। ওসির অনুরোধে ফাঁকা ফায়ার করা হলে মানুষ ভয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে। তখন চান্দ মিয়া তাদের শান্ত করেন। এ ফায়ার এক ভুলেরও সূচনা করেছিল। যার মূল্য দিতে হয় মুক্তিযোদ্ধাদের পরবর্তীতে ৫ জুলাই। সালেহ চৌধুরী ও চান্দ মিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে দিরাই যান। খবর পেয়ে আব্দুল কুদ্দুস নৌকায় আসেন। বিকাল তিনটার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা দিরাই থানা আক্রমণ করে প্রচুর গোলাগুলি শুরু করেন। এ সময় সালেহ চৌধুরী, চান্দ মিয়া ও আব্দুল কুদ্দুস নৌকায় অবস্থান করেন। অনেক চেষ্টার পর তারা গোলাগুলি থামাতে সক্ষম হন। এ সময় একজন ওসি ও সাব ইন্সপেক্টর মারা যান। দিরাই শাল্লার সমস্ত অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে আসে। এ সকল অস্ত্র পাঠানো হয় বালাট সেক্টরে। এই হলো দিরাই শাল্লার ও সুনামগঞ্জের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি।

এরপর আবার পাক আর্মি এসব অঞ্চলে অভিযান চালায়। তারা প্রথমে আক্রমণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল দিরাইয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রাম চান্দপুরে। সেখানে তখন অবস্থান করছিলেন কিছু মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু তারা সেখান থেকে সরে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেদিন ধরা পড়েছিল চান্দপুরের দুইজন মহিলা। তারা হলেন দিরাই শালার পাক হানাদার কর্তৃক প্রথম নির্যাতিত মহিলা। এরপর হানাদারবাহিনী দিরাইয়ের মুক্তিযোদ্ধা চাঁন্দমিয়ার বাড়ি ও মুক্তিযোদ্ধা সালেহ চৌধুরীর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, তারা চান্দ মিয়ার পরিবারের সমস্ত সদস্যদের গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দেয় স্থানীয় রাজাকারদের। যাকে যেখানে পাওয়া যায় তাকে সেখানেই গুলি করে হত্যা করবে-এই ছিল তাদের আদেশ। পাক আর্মিরা তার ছোট ভাই ধনমিয়াকে ধরে নিয়ে অমানবিক নির্যাতন করে। ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। শুধু তাই নয়, তাদের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয় শাল্লাবাসী।

হানাদারদের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয় শাল্লা থানার ডুমরা গ্রামের হরিপ্রিয়া নামের এক মহিলার পরিবার। চোখের সামনে তার স্বামীকে গাছের সঙ্গে পেরেক মেরে ব্রাশফায়ার করে ঝাঁঝরা করে দেয় বুক। তার ছয় মাসের শিশুটিও জল্লাদদের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। হানাদারদের হত্যা, গণহত্যা এমনি এক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল যে, সেদিন প্রবল তৃষ্ণায় এক ফোঁটা জল নদী থেকে মুখে দেওয়ার উপায় ছিল না। নদীতে ভেসে আসা সদ্য হত্যা করা লাশ, কয়েক দিনের পঁচা লাশ, লাশের পঁচা অংশ বিশেষ সব মিলিয়ে এ যেন নদী নয়, লাশের বধ্যভূমি। হানাদাররা সারিবদ্ধ করে বেঁধে ব্রাশফায়ারে নিরীহ মানুষকে মেরে ভাসিয়ে দেয় নদীতে। কী বীভৎস এই দৃশ্য!

শুধু তাই নয়, মানুষকে দেয়া হয় জীবন্ত সমাধি। এমন এক জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয় ছিরামিসি গ্রাম। ৩১ আগস্ট ১৯৭১। ২৪ জন পাকসেনা কিছু রাজাকার ও আলবদরদের নিয়ে আসে ছিরামিসি গ্রামে। তারা গ্রামবাসীকে শান্তি কমিটির মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয় এবং সেখানে তাদের উপস্থিত করা হয়। এমন সময় হানাদাররা শিক্ষিত যুবকদের বেঁধে ফেলে। এদের নৌকায় নিয়ে গুলি করে ভাসিয়ে দেয় পানিতে। আবার কোনো দলকে পুকুরের পাড়ে নিয়ে সারিবদ্ধ করে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে কুকুর বিড়ালের মতো হত্যা করে। সেদিন ছিরামিছি গ্রামে প্রায় ২১৬ জন লোক হত্যা করে হানাদার বাহিনী। হানাদাররা তাদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে ধরে আনা মহিলাদের ঘরে তালাবদ্ধ করে নির্মমভাবে হত্যা করে। তারা শিশুদেরও হত্যা করে। এই নৃশংস অত্যাচারের শিকার শুধু দিরাই শাল্লাবাসী নয়, সারা বাংলার মানুষ।

সমস্ত অত্যাচারের মুখেও কিন্তু পিছিয়ে পড়েননি চান্দ মিয়া। দেশের টানে, দেশের মানুষের টানে নিজ স্ত্রী-সন্তানদের খোঁজ পর্যন্ত নেননি। তার স্ত্রী সন্তান কোথায় আছে কীভাবে আছে বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে তা জানার চেষ্টা করেন নি। নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য নিয়জিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজের যা ছিল এবং ফেলে যাওয়া অনেক মানুষের টাকা-পয়সা যারা প্রাণভয়ে এদেশ ছেড়ে ইন্ডিয়া চলে গিয়েছিল তাদেরকে সাহায্য করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের টাকা-পয়সা দিয়ে আসেন।
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রকৃতভাবে হানাদারমুক্ত হয়। ত্রিশ লাখ জীবনের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন হয়। মানুষ আবার ফিরে আসে তাদের নিজেদের ঘরে। সেদিন মুক্তির আনন্দে স্বামীহারা স্ত্রী সবাই ভুলে যায় তাদের সেই হারানো বেদনা।

সূত্রঃ জ-৬৬১২

সংগ্রহকারী ::	বর্ণনাকারী :
মায়িশা ফারযানা দিপা	**মো. চান্দ মিয়া**
দিরাই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	গ্রাম : দিরাই দাউদপুর, ডাক: দিরাই চান্দপুর
অষ্টম শ্রেণি, শাখা : খ, রোল : ৩	থানা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ
	বয়স : ৭৮ বছর

বাবার পরিবর্তে আমাকে নাও

আমার কাকিমা বলেন, কিছু স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে। দিরাই থানার দাউদপুর এলাকায় তখন আমি সপরিবারে বাস করি। আমার কোলে ১২ দিনের এক মেয়ে ছিল। একদিন ভোরে আমি বাইরে গিয়েছি তখন হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা গেল। আমি ভয়ে দৌড়ে ঘরে চলে আসি। বাইরে সাধারণ মানুষের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ আকাশে চেয়ে দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখপাখালি ভয়ে দল বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। আমার শ্বশুর আমার মেয়েকে দিয়ে বললেন, সবাই পালাও। আমরা গ্রাম ছেড়ে ছুটতে লাগলাম। সে সময় ছিল খুব বৃষ্টি। নদীর শেষ প্রান্তে এসেছি। অনেক মানুষ পার হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আমরাও পার হলাম। পার হতে হতে বিকেল হয়ে এলো। নদীতে ছিল প্রচণ্ড ঢেউ। নৌকা থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম সমস্ত দিরাইকে পুড়িয়ে ফেলছে। মনে মনে ভাবলাম, আমাদের এত সুন্দর গ্রামকে নষ্ট করে ফেলছে? কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানিরা আমাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। আমরা যে এলাকায় গিয়েছি সেখানকার কিছু মানুষ রাজাকারের খাতায় নাম লিখিয়েছে। এ সংবাদের কিছুদিন পরে মুক্তিযোদ্ধারা ওই এলাকায় হামলা চালায়। তখন আমরা ছিলাম ঘুমে, তারা এসেছিল রাজাকারদের খতম করার জন্য। আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখি রাজাকাররা সব চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওরা আমাদের কিছু বলেনি, হয়তো বুঝতে অসুবিধা হয়নি আমরা অসহায়। তখন মুগ্ধ হয়ে দেখলাম মুক্তিযোদ্ধাদের।
যুদ্ধ চলাকালীন আমার স্বামী দিরাই আসা-যাওয়া করত। তার মুখ থেকে শুনেছি। দিরাই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের এক মাস্টার ছিল। তার নাম বকুল মনি। তিনি দিরাই তানপুর এলাকায় থাকতেন। বকুল মনি মাস্টারকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে যায়। তারপর পাকিস্তানিরা মাস্টারকে বলে, মরার আগে তার শেষ ইচ্ছাটা কী? বকুল মনি মাস্টার বলেন, মরার আগে আমার শেষ নিঃশ্বাসটা দিরাই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে যেন হয়। তাকে রুমে হাত-পা বেঁধে পিচাশরা অনেক মারধর করে। এ খবর শুনে তার মেয়ে ছুটে আসে এবং বাবার প্রাণভিক্ষা চায়। পাকিস্তানিদের পায়ে ধরে অনেক কাঁদে কিন্তু রাজি হয় না তারা। অবশেষে মেয়েটি বলে, বাবার পরিবর্তে তোমরা আমাকে নাও। তারা তখন তার বাবাকে ছেড়ে দেয় এবং মেয়েটিকে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পাশবিক নির্যাতন করা হয়। পরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মেয়েটি পাগল অবস্থায় মারা যায়। ভাবতে খুব কষ্ট হয় কত নারী এমনভাবে নির্যাতিত হয়ে আত্মহত্যা করেছে।
মাসখানেক পরে আমরা বাড়িতে চলে আসি। তখন বিমান দিয়ে হামলা শুরু হয়। গ্রামের সবাই মাটি খুঁড়ে গর্ত করে থাকার ব্যবস্থা করে। বিমানের শব্দ শুনলে আমার নানা-নানী আত্মরক্ষার জন্য ছেলেমেয়েকে নিয়ে গর্তে গিয়ে বসে থাকত। আমার দেবররা বাইরে থেকে এলে আমার মেয়ে গিয়ে বলত, কাকু কাকু বিমান

এসেছিল আমি আর ফুপু গর্তে গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম। ও তখন অস্পষ্টভাবে কথাগুলো বলত আমার দেবররা তা শুনে হাসত আর বলত, তোর মা পালায়নি ? এভাবে দুঃখ হাসি নিয়ে কেটে গেল নয় মাস। আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের ও কষ্টের কাহিনি হচ্ছে, আমার মামাতো ভাইকে নির্মমভাবে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে। কত শিশুকে পায়ের তলায় পিষে নির্মমভাবে হত্যা করেছে তার হিসেব নেই। তবুও আমরা আজ স্বাধীন। স্বাধীন দেশের মুক্ত আলোতে এখনকার শিশুরা বড় হচ্ছে। এটাই আমার বড় সান্ত্বনা।

সূত্র: জ-৬৭৪৮

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
নুসরাত ইয়াস মিন নিশা	**মাসুদা বেগম**
দিরাই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	সম্পর্ক : বড় কাকি
নবম শ্রেণি, খ শাখা, রোল : ২৬	বয়স : ৫৭

কেউ ফিরে এলো কেউ ফিরলো না

আমার ছোট মামা সনৎ কুমার দাস পেশায় শিক্ষক। আমি তার বিবরণ তার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের যে ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক ইতিহাস শুনেছি তা বর্ণনা করা কষ্টকর। চাক্ষুষ ঘটনা শুনতে গিয়ে যেন নিজেই দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তান সেনাদের অমানবিক অত্যাচার। মামা বলেন, সেদিন ছিল ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১। সকাল আটটার সময় হঠাৎ গ্রামের মানুষের মুখে মুখে ধ্বনি উঠল পাঞ্জাবি! পাঞ্জাবি! সেদিন হানাদার বাহিনী নৌকায় করে মাকালকান্দি গ্রাম আক্রমণ করতে আসে। গ্রামে উঠেই ওরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে লাইনে দাঁড়াতে কঠোর নির্দেশ দেয়। এতে কিছু কিছু লোকজন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে আর কিছু লোক পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্তত পাঁচ-ছয়জন পানিতে পড়া লোককে লক্ষ্য করে তারা বন্দুকের গুলি ছুড়ে হত্যা করে। তখন ভয়ে আর কেউ দৌড়াদৌড়ি না করে ঘরের আড়ালে পালানোর চেষ্টা করে এবং যারা পালাতে পারেনি তাদেরকে লাইনে দাঁড়া করিয়ে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বুলেটের আঘাতে যারা মারা যান তারা হলেন, গিরিশ চন্দ্র চৌধুরী (৮০), গিরিশ চন্দ্রের স্ত্রী (৬০), সুরেন্দ্র বাবুর স্ত্রী (৫০), উনার মা বয়স (৮০), কুমুদ রঞ্জন চৌধুরী (৩০), জগাই দাস (৬০), আরো নাম না জানা অনেক মানুষ। তারা সবাই মাকালকান্দি গ্রামের পূর্ব হাটির বাসিন্দা। তাজা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল মাকালকান্দি গ্রামের মাটি।

এবার মাকালকান্দি গ্রামের পশ্চিম হাটির অবস্থার চিত্র বর্ণনা করা হল। মাকালকান্দি গ্রামটি হাওরের মাঝে অবস্থিত। বর্ষাকালে গ্রামের চারদিকে অথৈ পানি। হেঁটে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। প্রচণ্ড ঢেউয়ের কারণে বর্ষাকালে নৌকা রাখা সম্ভব হয়নি। তাই বর্ষাকালে মানুষ পানিবন্দি হয়েই ওই গ্রামে বাস করে। পাকহানাদার বাহিনী নৌকা যোগে সেখানে আসে এবং পশ্চিম হাটিতে নৌকা লাগিয়ে মানুষকে লাইনে দাঁড়াতে নির্দেশ দেয়।

ছোটাছুটি করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে ভয়ার্ত লোকজন, কিন্তু পানিতে পড়লেই জীবন বাঁচে না। সেনারা নির্বিচারে গুলির আঘাতে হত্যা করতে থাকে পলায়নপর মানুষকে। তারপর শুরু করে বাধ্যতামূলক লাইনে দাঁড় করানো। লাইনে দাঁড় করিয়ে কমান্ডারের হুইসেলের সাথে সাথে চলে গুলি। পশ্চিম হাটিতে যারা গুলিতে মারা যান, তারা হলেন কর্ণ সরকার (৮০), বেনু বাবু (৪০), উপেন্দ্র সরকার (৫০) এবং আরও প্রায় ৬০-৭০ জন মানুষ। রক্তে লাল হয়ে গেল কর্দমাক্ত মাটি। শুধু মানুষ খুন করেই ওরা ক্ষান্ত হল না, ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে ভয়াবহ সৃষ্টি করল। গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে যখন বিদায় নিল তখন দুপুর প্রায় বারোটা। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। মানুষের লাশ ভেসে যাচ্ছে পানিতে, লাশ পড়ে আছে উঠানে আর কোথাও দেখা যাচ্ছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে লোকজন।

তারপর শুরু হলো ভরতের শরণার্থী শিবিরে যাওয়ার পালা। বেঁচে থাকা লোকজন ব্যবস্থা গ্রহণ করল এবং কষ্টকর যাত্রা শেষে তারা ভারতে পৌঁছাতে পারল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেখানে আশ্রয় দেন। তাতেও আবার কত বিপদ। তাদেরকে ভারত সরকার রিলিফ দিয়েছে, থাকার ঘর দিয়েছে। থাকার ঘর আর রিলিফ দিলে কি হবে? শিবিরে অতিরিক্ত লোক বসতির কারণে কলেরা মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ল। মারা গেল শত শত মানুষ। রোগে ঔষধ নাই, পেটে ভাত নাই। পরনে কাপড় নাই, কী যে বিভীষিকাময় অবস্থা! অনেক সময় বৃদ্ধ

বৃদ্ধাকে মানুষ জীবিত অবস্থাতেই ফেলে রেখে আসত। কিন্তু কে বা কারা ফেলে দিয়েছে এর কোনো খবর পাওয়া যেত না। এই অবস্থাতে অনাহারে অর্ধাহারে দিন চলতে লাগল। কারো কারো পরিবার থেকে যুবকরা স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে চলে যেতে লাগল। কেউ কেউ ফিরে এল আবার কেউ কেউ ফিরল না। এভাবেই কেটে গেল নয়টি মাস। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানিরা। এই নয় মাস বাঙালির কত যে কষ্টে দিন কাটাতে হয়েছে তা ভাষায় লিখে শেষ করা যাবে না।

সূত্র: জ-৬৭৪৯

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
সুপ্রিয়া তালুকদার	**সনৎ কুমার দাস**
দিরাই উচ্চ বালিকা বিধ্যালয়	সহকারী শিক্ষক
৮ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ১৪	নবীগঞ্জ জে কে উচ্চ বিদ্যালয়
	বয়স : ৫৫, সম্পর্ক : মামা

পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মারা যান

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার দাদার বয়স ছিল ৫৫ বছর। তখন দাদা কাঁচামালের ব্যবসা করতেন। একদিন তিনি ব্যবসা করার জন্য ভৈরব যান। ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনী হামলা করেছে এই কথা শুনে তিনি দিরাই চলে আসেন। হঠাৎ একদিন দিরাই বাজারে পাকিস্তানি বাহিনী হামলা করে। দাদা তার দোকানের জিনিসপত্র ফেলে বাড়িতে চলে আসেন। পরের দিন সকালে গোলাগুলির আওয়াজ শুনে আমার কাকা একটি নৌকায় করে আমার বাবা, চাচা, ফুফু ও দাদিকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন। নৌকা দিয়ে যাওয়ার সময় তারা অনেক মৃতদেহ ভাসতে দেখেন, যাদেরকে পাকিস্তানি বাহিনী গুলি করে মেরেছে।

হঠাৎ একদিন চেয়ারম্যান ও রাজাকাররা দাদাকে তাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য খবর দিল। দাদা সেখানে গেলে তারা দাদাকে ২২০০ টাকা চাঁদা দিতে বলল ও দোকান খোলার নির্দেশ দিল। দোকান খোলার পর তারা দোকানের সব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেল। এর ফলে দাদা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও রাজাকাররা তাকে এসে বলল, পাকিস্তানি বাহিনী নিয়ে নৌকা চালাতে হবে। দাদা বললেন, আমি খুব অসুস্থ। রাজাকাররা তখন বলল, তোমার ছোট ভাইকে এনে দাও। দাদার ছোট ভাই তখন পালিয়ে অন্য বাড়িতে থাকতেন। তাকে তারা ধরে নিয়ে গেল। এর পরের দিন দাদার বড় ভাইকে ধরে নিয়ে গেল। রাজাকাররা দাদার বড় ভাইকে বলল, পাকিস্তানি বাহিনী নিয়ে হাওরে হাওরে নৌকা চালাতে। দাদার বড় ভাই তিন দিন নৌকা চালালেন। দেখলেন যে, সে সময় পাকিস্তানি বাহিনী অনেক মানুষকে গুলি করে মেরেছে। আমার পাশের বাড়ির একজন ফুফু খুব সুন্দর ছিলেন। রাজাকাররা ফুফুর কথা পাকিস্তানিদের বলে। পাকিস্তানিরা ফুকুকে ধরার জন্য বাড়িতে আসলো। ফুফু তা টের পেয়ে সাথে সাথে আমাদের পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পানিতে ডুবে মারা যান। পাকিস্তানি বাহিনী অনেক নারীকে নির্যাতন করেছে।

সূত্র: জ-৬৭৫০

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
তাসলীমা বেগম	**হাজী আ. জলিল**
দিরাই উচ্চ বালিকা বিধ্যালয়	গ্রাম : ভাঙ্গাঢহর, ডাক: দিরাই চাঁদপুর
৮ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ৪৭	থানা : দিরাই, সুনামগঞ্জ
	বয়স : ৮০, সম্পর্ক : দাদা

কঙ্কাল সৎকার

শ্রাবণ মাসের মনসা পূজার দিন হবিগঞ্জ জেলার আজমিরী থানার মাকালকান্দী গ্রামে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ভোর পাঁচটায় নৌকা করে এসে পাকবাহিনী গ্রাম বাসীর উপর আক্রমণ করে। কেউ কেউ ছোট নৌকায় করে বাড়িঘর ছেড়ে পূর্বেই চলে গেছে ভারতের উদ্দেশে। আর বেশিসংখ্যক লোক গ্রামেই ছিল। ষোলটা বাজিতপুরী নৌকায় পাকবাহিনী গ্রামকে ঘিরে ফেলে। তারা যাকে পায় তাকেই গুলি করে মারতে থাকে। কিছুসংখ্যক লোককে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারে। ওই গ্রামের দ্বিতীয় ধনী ছিল অবনী বাবু। তাঁর মা বাড়ির মায়ায় বাড়ি ছেড়ে যাননি। অবনী বাবুর মা দেবতা ঘরের সামনে এক লোটা কাঁচা টাকা কাপড়ের আঁচলে বেঁধে মা লক্ষ্মী দেবীকে ভক্তি দিয়ে মণ্ডপে বসে রইলেন। হঠাৎ পাকবাহিনী এসে সব ঘর খুঁজতে খুঁজতে লক্ষ্মী মণ্ডপে দেখতে পেল একজন মানুষ। তাঁকে দেখে পাকবাহিনী গুলি করে মারল। আর একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের দুই মেয়েকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে যায়। তখন মেয়ের মমতায় বাবা তাদের পেছনে পেছনে অগ্রসর হন। পাকবাহিনী তার বাবাকে মারধর করে সরিয়ে দেয় আর দুই মেয়েকে তাদের বাবার সামনেই নির্যাতন করে মেরে ফেলে। আর তার বাবাকেও গুলি করে মেরে ফেলে। ওই লোকের দুই মেয়ে ও তিন ছেলে ছিল। বড় দুটি ছেলে অন্য লোকের সঙ্গে আগেই চলে গেছে। আর তার মা পাঁচ দিনের বাচ্চা নিয়ে ঘরে বসে রইল। তখন পাকবাহিনীর লোকেরা তার মাকে দেখেও কিছু করেনি। তার মা কোলে পাঁচ দিনের বাচ্চা নিয়ে স্বামী ও ছেলেমেয়েদের খুঁজতে লাগল। এই ঘটনার মধ্যে তার পাঁচ দিনের কোলের বাচ্চাটা কোথায় পড়ে গেল সে আর বলতে পারে না। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। পাকবাহিনী দুপুর বারোটায় গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে যায়।

আনুমানিক বিকেল চারটার সময় তার মার জ্ঞান ফিরে এলো। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে ছোট নৌকায় করে ওই গ্রামটা দেখতে কয়েকজন লোক আসে। তারা তাকে দেখে স্বামী-ছেলেমেয়ের কথা জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন, আমি বলতে পারি না। তখন ওরাও খুঁজতে লাগল। খুঁজে বাচ্চাটা বের করে এনে তার মার কোলে দিল। তখন মা বলল, আমার দুই মেয়ে, দুই ছেলে কোথায়? আমার স্বামী কোথায় ? ওরা বলল, আমরা গ্রামে খুঁজেছি কোথাও পাইনি। লোকগুলো বললো, তুমি একা একা এই গ্রামে থেকে কী করবে, আমাদের সাথে। তার মা তার পাঁচ দিনের বাচ্চাটাকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে চলে গেল। এই পাঁচ দিনের ছেলেটির নাম রাখল স্বাধীন।

যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন অবনী বাবু তার পরিবারের লোক নিয়ে গ্রামে ফিরে এলো। এসে দেখল ঘর-দরজা সব পাকবাহিনী পুড়িয়ে ফেলেছে। কোনো কিছুরই চিহ্ন নেই। শুধু ছাই আর ছাই, আর মানুষের মৃতদেহ নিচে পড়ে আছে। অবনী বাবু তাঁর মাকে খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে দেবতা ঘরের সামনে একটি মানুষের কঙ্কাল দেখতে পেল। কঙ্কালের নিচে পেল ওই কাঁচা টাকা আর একটি চশমা। সেটা যে অবনী বাবুর মায়ের কঙ্কাল তা দেখে তিনি চিনতে পারলেন। তখন তিনি মায়ের কঙ্কাল সৎকার করলেন।

সূত্র: জ-৬৭৫৫

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
শতরূপা দাস রায় (দিতি)	**আশা রানী দাস**
দিরাই উচ্চ বালিকা বিধ্যালয়	গ্রাম : এলংজুরী, ডাক: ব্রজেন্দ্রগঞ্জ
সপ্তম শ্রেণি, রোল : ৪	থানা : দিরাই, সুনামগঞ্জ
	বয়স : ৫৫

দৌড়াতে দৌড়াতেই দেশ স্বাধীন হয়ে গেল

ছাতক শহরে আমার দাদার একটি হোটেল ছিল। হোটেলটির নাম "মর্ডান রেসিডেনসিয়াল হোটেল"। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু ছাতকে তখনো পাকবাহিনী আক্রমণ করেনি। এমতাবস্থায়, আমার বাবা এবং বাবার এক বন্ধু কামাল মিলে হোটেলে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ তারা শুনলেন যে, পাকবাহিনী ছাতক শহরে আক্রমণ চালিয়েছে। তখন লোকজন চারদিকে ছোটাছুটি করছিল। বাবা এবং তার বন্ধু ভয়ে হোটেলের মধ্যে

দরজা বন্ধ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর তারা দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখেন চারপাশে পাকসেনারা ঘিরে আছে। একজন লোক রিকশা চালিয়ে আসছিল, পাকবাহিনী তার ওপর গুলি চালায় এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বাবার বন্ধুটি ছিলেন খুবই ভীতু। এ দৃশ্য দেখে তিনি ভয়ে একেবারে নাজেহাল। আমার বাবাও ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু বুকে সাহস রেখে তার বন্ধুকে সাহস দিচ্ছিলেন। এরপর তারা আর কিছুক্ষণ দরজা বন্ধ করে রইলেন। তখনো চারদিকে প্রচণ্ড গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আর কিছুক্ষণ পর তারা সাবধানে পেছনের দরজাটা খুলে দেখলেন হোটেলের পাশের সামাদ মার্কেটে পাকবাহিনী আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তখন তারা ভাবলেন আগুনে পুড়ে মারা যাওয়ার চেয়ে গুলি খেয়ে মরা ভাল। কিন্তু কী করে বের হবেন? চারদিকে যে পাকবাহিনী ঘিরে রেখেছে।

এদিকে আমাদের হোটেলেরও প্রায় অর্ধেটা আগুন ধরে গেছে। উপায় না দেখে তারা বুকে সাহস রেখে পেছনের দরজা দিয়ে ড্রেনে পড়ে কালীবাড়ির রাস্তার দিকে রওনা হলেন। কিন্তু কিছু পথ না যেতেই দেখা গেল সেখানেও পাকসেনারা ঘিরে আছে এবং হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তখন তারা সেখানে না গিয়ে ফিরে এলেন এবং পথে দেখতে পেলেন কয়েকটি কামারের ঘর। কোনো মানুষ সেখানে নেই, সভয়ে পালিয়ে গেছে। তারা দুজন আস্তে আস্তে সে ঘরে ঢুকে রান্নাঘরের দিকে গেলেন। গিয়ে দেখেন বাসনপত্র কিছুই নেই। শুধু তিন-চারটি কাঠ কয়লার বস্তা রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা পাকবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে বস্তার আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। কিন্তু সেখানে প্রচুর মশা, মশাগুলো যেন তাদের একেবারেই ঘিরে ফেলল। মশা মারলে শব্দ হবে ভেবে তারা শুধু শরীরে হাত বুলাতে থাকেন। কিন্তু মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন বস্তাগুলো খালি করে বস্তার ভেতরে ঢুকে পড়লে অন্তত মশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তাই তারা বস্তার ভেতরে থাকলেন। ভোরে তারা ফজরের আজান শুনতে পান।

আজান শোনার সাথে সাথে তাদের মনে সাহস এলো এবং তারা বস্তা থেকে বের হয়ে খুব তাড়াতাড়ি করে রওনা দিলেন। কিছুপথ অতিক্রম করার পর দেখেন মন্টু জমিদারের বাড়ির পাশে অনেক পাকসেনার গাড়ি। তারা দেখলেন পাকসেনারা জমিদারের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ভয়ে তারা ডাকবাংলো রোড দিয়ে দৌড়ে গেলেন এবং বাবা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু বাবার বন্ধু নদীতে ঝাঁপ না দিয়ে নদীর পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে দৌড়ে গেলেন। বাবা নদীতে আস্তে আস্তে লাশের মতো ভেসে ভেসে যেতে তার প্রায় দুই ঘণ্টা লেগে গেল। পাড়ে ওঠার পর পাথরের স্টেকের কাছে যেতেই বাবার ডান দিকে একটি গুলি লাগে। তখন বাবা বাঁ দিকে তাকালেন এবং অনুভব করেন সে দিকেও একটি গুলির শব্দ। কোনো উপায় না দেখে বাবার মাথায় চট করে একটি বুদ্ধি এলো। গুলি খেলে মানুষ যেমন পড়ে যায় তেমনি বাবাও মাটিতে পড়ে রইলেন। পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পাথরের স্টেকের আড়ালে চলে গেলেন। নদীর ওপারে লোকজন ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। বাবাও তাদের পিছে পিছে ছোটোছুটি করতে লাগলেন এবং দেখলেন পাশে গণেশপুর গ্রামে কিছু লোক গাছের নিচে বসে আছে, তারা বাবাকে ডাকছে। বাবার মনে হলো ওরা মিলিটারিদের কথায় বাবাকে ডাকছে। বাবা ভয়ে দৌড় শুরু করলেন এবং দেখলেন বাবার পিছে পিছে ওদের মধ্যে দুজন লোক দৌড়াদৌড়ি করছে এবং বাবাকে ডাকছে। বাবা তাদের কথায় দাঁড়িয়ে রইলেন এবং দেখলেন ওরা দুইজন বাবার সহপাঠী। ওরা বলছে ওদিকে কোথায় যাস সামনে মিলিটারি ক্যাম্প। পরে তাদের মধ্যে একজন বাবাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। বাবা বললেন, আমি দুই দিনের মধ্যে কিছু খাইনি। আমাকে কিছু খেতে দে। তখন বাবার সহপাঠী নিজে একটি ডিম ভেজে তাকে ভাত দিল। কিছু ভাত খেতে না খেতেই খবর এলো গণেশপুর গ্রামে মিলিটারি ঢুকেছে। বাবা ভাত রেখে দৌড়াচ্ছেন এবং সাথে সাথে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ দৌড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বাবা তাকিয়ে দেখেন তিনি যাদের সঙ্গে দৌড়াচ্ছেন তারা কেউ বাবার পরিচিত নয়।

দৌড়াতে দৌড়াতে তিনি দেখেন ভারতের সীমান্তের পাশে কুনীমুড়া বাজারের কাছে পৌঁছে গেছেন। সেখানে গিয়ে আমাদের এলাকার কিছু লোকের সাথে তার দেখা হয়। তারা বলেন, তুমি এখানে কী করে এলে? তখন তিনি তাদের কাছে সব কথা খুলে বললেন। তোমাকে পেয়েও যদি আমরা ছেড়ে দিই তাহলে তোমার বাবা-মার কাছে আমাদের জবাব দেওয়ার মতো কিছুই থাকবে না। এরপর তিনি তাদের কাছে ১৫ দিন থেকে গেলেন। ১৫ দিন পর তিনি তাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে দেশও স্বাধীন হলো।

সূত্র: জ-৬৯৫২

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
কুলসুমা বেগম	**ফরিদ উদ্দীন**
গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : বাবা
৯ম শ্রেণি, রোল : ০৪	

রণজিৎ চন্দ্রের যুদ্ধ স্মৃতি

৭ মার্চের ভাষণের পর আমাদের দিঘলী গ্রামের হেমেন্দ্র কুমার দাশ পুরকায়স্থের বাড়িতে এক কর্মী মিটিংয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়। পরে ১৩ মার্চ দিঘলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্বে এক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে অত্র এলাকার নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তারা হচ্ছেন, কানাই মেম্বার সাং : সাঙ্গীরাই, তজম্মুল মিয়া চেয়ারম্যান, মো. ঠাকুর মিয়া সাং : ভুরকী, নজির মিয়া সাং : দিঘলী, খদরিছ মিয়া সাং : বুড়িচর এবং কামিনী চৌধুরী সাং : কান্দিপাতা। এছাড়া আরো ৪০-৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। ওই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কর্নেল আতাউল গনি ওসমানী। এই মিটিংয়ে ওসমানী সাহেব আমাদেরকে বলেন, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিতে হবে এবং পাঞ্জাবিদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে। আমাদের এলাকার ছাত্রজনতার মধ্যে তখন মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

এর কিছুদিন পর বেতারের মাধ্যমে শুনতে পাই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা, যার যা কিছু আছে তা দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর। ২৫ মার্চ রাত আনুমানিক বারোটা থেকে পাকসেনারা নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালিদের ওপর। শুরু হয় গনহত্যা । এর পর থেকে আমাদের মনে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার চিন্তা শুরু হয়। ৫ এপ্রিল আমাদের দিঘলী গ্রামের একজন ব্যবসায়ী জিতেন্দ্র দাশ, মদন মোহন কলেজের ছাত্র নারায়ণ সেন এবং জগন্নাথপুর নিবাসী আরো একজন অপরিচিত লোকসহ মোট তিনজনকে সকাল আনুমানিক সাড়ে ছয়টার সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা গোবিন্দগঞ্জ রেলপয়েন্টের সামনে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই ঘটনার পর পরই দিঘলী গ্রামসহ এলাকার লোক ভয় পেয়ে ভারতের উদ্দেশে পালাতে থাকে।

আমি আমার মা, ভাইবোন, কাকা-কাকিকে ভারতের ইছামতী ক্যাম্পে রেখে মুক্তিযুদ্ধে চলে যাই। আমার সাথে ছিলেন গ্রামের কাজল দাস এবং কিরন মালাকারসহ আরো ৩০-৩৫ জন। মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ও উপেন্দ্র দেবনাথের মাধ্যমে আমরা মেঘালয়ের ডেংরাই ইউথ ক্যাম্পে ভর্তি হই। সেখানে আমাদের চুলকাটানো ও মেডিকেল করানো হয়। ইনজেকশন দেওয়া হয়। ডিসিপ্লিন, রোলকল ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পিটি করানো হয়। তখন সেই প্রশিক্ষণ দিতেন দুলন মিয়া। এই ক্যাম্পে ছিলেন ভারতীয় মিত্রবাহিনীর পক্ষে ইনচার্জ এমসি বসাক। আমাদের মুজিবনগরের পক্ষে ছিলেন ক্যাপ্টেন মঈন, মৃদুল দাশ পুরকায়স্থ, মানিক মিয়া, গনি মিয়া এবং সৈয়দ সাহেব। তাদের মাধ্যমে আমাদেরকে অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয় মেঘালয়ের ইকোয়ান প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে। সফলভাবে ২১ দিন প্রশিক্ষণ শেষে ভোলাগঞ্জ সাব সেক্টরে নিয়ে আসা হয়। সাথে আমাকে একটি এসএসআর ও ১০০ রাউন্ড গুলি দেওয়া হয়। তারপর আমরা আলফা কোম্পানির সাথে মিলিত হয়ে কোম্পানি কমান্ডার জিএম ফখরুদ্দিন চৌধুরীর নির্দেশে লাখানীগাও যাই।

সামনে ছাতকের লালটিয়া নামক স্থানে পাঞ্জাবিদের ক্যাম্প ছিল। আমরা সেই ক্যাম্পে আক্রমণ করি, কিন্তু তাদের পাল্টা আক্রমণে টিকতে না পেরে বুরদেও নামক স্থানে চলে যাই। এখনে ৪ ও ৫ নং সেক্টরের একমাত্র এমবিবিএস ডাক্তার হারিছ আলীর চিকিৎসার মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা হয়। তারপর আমরা বিলাজুড় ও বনী গ্রামে পাঞ্জাবিদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হই। কিন্তু এই যুদ্ধে আমরা আর পিছু হটিনি। দুইজন পাকসেনাকে নিহত করে পাঞ্জাবিদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দিই। কিন্তু এই যুদ্ধে পাকসেনাদের নিক্ষিপ্ত শেলে আমাদের নাম না জানা তিনজন সহযোদ্ধা শহীদ হন। এই যুদ্ধে আমার সাথী ছিলেন আলাউদ্দিন, ময়না মিয়া, আঃ আহাদ, কাজল দাস, কিরণ মালাকার, উমেশ দাস, বশির মিয়া, কালা মিয়া, আঃ করিম, আবু তাহের আলমগীর কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন জিএম ফখরুদ্দিন চৌধুরী এবং অপারেশন কমান্ডার ছিলেন ওয়াছিব উলাহ।

এরপর আমরা উমাইর গাও গ্রামে এসে পাঞ্জাবি ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হই। এখানে আমাদের এক সহযোদ্ধা শহীদ হন। তার নাম ছিল হেলন মিয়া। সেখান থেকে আমরা পুটামারা গ্রামে চলে আসি।

সেখান থেকে পারকুল কালারুকা গ্রামে রাত আনুমানিক দুইটার সময় এক পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন আমাদের খবর শুনে চলে আসে। গ্রামে এসে বলতে থাকে, কাহাহে মুক্তি হারামিকা বাচ্চা। এই কথা শুনে আমরা তাকে ধাওয়া করি এবং এলএমজির ব্রাশফায়ারে বেলুচি ক্যাপ্টেনসহ এক রাজাকার নিহত করি। বাকিরা হটে যাওয়ার পর আমরা তাদের অস্ত্রগোলা বারুদসহ খাদ্যসামগ্রী নিয়ে নৌকাযোগে পুটামারা চলে আসি। সেখান থেকে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে অবস্থান নিই শিবের বাজারের নোয়াপাড়া গ্রামে। সেখান থেকে পাগইল গ্রামে আঃ ছোবহানের বাড়িতে। আঃ ছোবহান ছিল একজন কুখ্যাত দালাল। তার এক ভাগ্নে ছিল আলবদর। আমরা তাদের ধরে চোখ বেঁধে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেই। সেখানে আমরা দুই দিন অবস্থান করি। চেঙ্গের খাল নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে বাদাঘাট নামক স্থানে পাঞ্জাবিদের ক্যাম্প ছিল।

১৪ ডিসেম্বর রাত্রি আনুমানিক একটার সময় থেকে পাঞ্জাবিদের সাথে আমাদের অবিরাম গোলাগুলি চলতে থাকে। ১৬ ডিসেম্বর বেলা দুইটা ৩০ মিনিটের সময় আমাদের আক্রমণে তারা টিকতে না পেরে আত্মসমর্পণের জন্য লাল ও সবুজের পতাকা উত্তোলন করে এবং একজন পথিকের মাধ্যমে আমাদের কমান্ডারের কাছে পত্র পাঠায়। এই সময় কমান্ডারের নির্দেশে আমরা যুদ্ধ বন্ধ রাখি। এই সুযোগে পাঞ্জাবিরা গাড়িতে উঠে সিলেটে চলে যেতে উদ্যত হয়। আমরা তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ি। এতে দুইজন রাজাকার মারা যায়। একজন রাজাকার পালিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়ে। তার নাম ছিল জালাল। পরে তাকে হত্যা করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে বাদাঘাট মাঠ থেকে লোকজন জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে আসতে থাকে।

এরপর আমরা চলে আসি টুকের বাজার মেইয়ার চর গ্রামের প্রাইমারি স্কুল মাঠে। সেখান থেকে ১৭ ডিসেম্বর রোড মার্চের মাধ্যমে আমরা আখালীয়া ইপিআর ক্যাম্পে অবস্থান নিই। আমরা ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেন্ট্রি ডিউটির মাধ্যমে সশস্ত্রভাবে অবস্থান করি। ১৯ ডিসেম্বর আমরা জানতে পারলাম যে ভারতীয় মিত্রবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই কথা জানতে পেরে আমাদের সাব-সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে কুমারগাঁওয়ের দক্ষিণে শেখেরগাঁও ও চরেরগাঁও এক বাড়িতে পাকা ঘরে ম্যাগাজিন তৈরি করা হয় ও পাহারা নিয়োগ দেওয়া হয়। সেখানে আমাদের সাব-সেক্টর কমান্ডার ও কোম্পানি কমান্ডারের মাধ্যমে আমরা আমাদের হাতের এসএলআর জমা দিই।

১৯ ডিসেম্বর আনুমানিক সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় ৫নং সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে সাব-সেক্টর কমান্ডার ও কোম্পানি কমান্ডারগণ আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে আমাদের নিয়ে আসেন। এখানে আমাদেরকে সেন্ট্রি ডিউটির মাধ্যমে অ্যালার্ট রাখা হয়। সার্চ করানো হয়। ডিসেম্বর পর্যন্ত আলিয়া মাদ্রসায় সাময়িক অবস্থান নিই। সেখানে আনুমানিক ২৫০ জন রাজাকার কোয়ার্টার গার্ডে রাখা হয়। পরে তাদের সিলেট সেন্ট্রাল কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ২৩ ডিসেম্বর সকাল বেলা ৪নং কমান্ডার সিআর দত্ত এক ঘোষণার মাধ্যমে বলেন যে, তোমাদের মুক্তিযুদ্ধ শেষ। আমাদের দেশ এখন শত্রুমুক্ত। তোমরা স্থায়ীভাবে বর্ডার সিকিউরিটি মিলেশিয়ায় যোগ দিতে পারো। আর যারা বাড়িঘরে যেতে ইচ্ছুক তারা চলে যেতে পারো।

এরপর আমি এয়ারপোর্ট মডেল স্কুলে চলে যাই। সেখানে ক্যাম্প ইনচার্জ ছিলেন লে. মাহবুবুর রহমান। সেখানে আনুমানিক আমরা দুই মাস প্রশিক্ষণ নিই। ভারতীয় মিত্রবাহিনী সেখানে প্রশিক্ষণ দিত। তখন হঠাৎ একদিন ওপর থেকে নির্দেশ এল প্রশিক্ষণ ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। আমরা যে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম তার সনদপত্র দাবি করি। তখন দেওয়ান ফরিদ গাজী ও তৎসময়ে সিলেট জেলা মহকুমা প্রশাসক মো. ভাই আমাদেরকে বলেন, তোমরা বাড়িঘরে চলে যাও, তোমাদের বর্তমানে রিলিফ কার্ড দেওয়া হবে এবং পরে তোমাদের সনদপত্র ও পুনর্বাসন করা হবে। পরে আমরা বাড়ি চলে আসি। বর্তমানে আমি একজন ইউপি মেব্বার হিসেবে জনগণের সেবায় নিয়োজিত।

সূত্র: জ-৬৯৭৩

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
অসীম ধর	**রনজিৎ চন্দ্র ধর**
গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৫৫ বছর
৯ম শ্রেণি, রোল : ১৭	

বিজয় পতাকা উত্তোলন করলেন

যার কাছ থেকে এই কাহিনিটি শুনেছি তিনি আমাদের পরিবারেরই একজন সদস্য। যুদ্ধের সময় তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তা আমি নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরছি।

২৫ মার্চ কালরাতে পাকহানাদার বাহিনী ঢাকায় নিরীহ মানুষের ওপর হামলা চালিয়ে অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছিল। তারা ঢাকা থেকে ক্রমেই শহর এবং শহর থেকে গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল। একদিন তিনি দেখলেন, সুনামগঞ্জ থানায় ভেড়িগাঁও গ্রামে পাকহানাদার বাহিনী প্রবেশ করেছে। তারা ওই গ্রামের মানুষকে নৃশংসতার সাথে হত্যা করল। এসব দৃশ্য দেখে তিনি ভীষণ মর্মাহত হলেন। তখন তিনি ভাবলেন এভাবে আর হত্যাকাণ্ড চলতে পারে না। দেশের মানুষকে অবশ্যই পাকহানাদারদের নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে হবে। তিনি দেশ ও দেশের মানুষকে মুক্ত করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং যোগ দিলেন মুক্তিবাহিনীতে।

তিনি ২০২ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ ভারতের বালাট হতে ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। দশ মাইল হেঁটে এক পাহাড়ে গিয়ে তারা পৌঁছলেন। এই সময় একজন ভারতীয় কমান্ডার তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই কমান্ডার ছিলেন পথপ্রদর্শক। কমান্ডার সাহেব বললেন, আমাদের হেঁটে লাওবা ক্যাম্পে যেতে হবে। তারা কোনো কিছু না জিজ্ঞাসা করে দুর্গম পাহাড়ের ওপর দিয়ে উঠতে শুরু করলেন এবং এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন, যেখানে দেখতে পেলেন বড় বড় পাথরের স্তূপ। সেখানে আরো দেখতে পেলেন বড় বড় কমলার বাগান। সেখানে প্রবেশ করে তারা কমান্ডারকে জিজ্ঞাসা করেন, এই জায়গাটির নাম কী? কমান্ডার উত্তর দিলেন, মেঘালয়। কিছু সময় পরে সেখানে পাঁচটি বাস এলো। বাসগুলো শিলংয়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল। ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে দেখতে পেলেন হাজার হাজার ছেলে ট্রেনিং নিচ্ছে। ২৮ দিন ট্রেনিং নেয়ার পর তাদেরকে তামাবিল সেক্টরে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়ে দিল।

প্রথমেই তারা তামাবিল পাকবাহিনীর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা গুলি বিনিময় করলেন। এরপর পাকবাহিনী তামাবিল ত্যাগ করে চলে গেল শালুটিকর। ওই সময় তামাবিলের কয়েক মাইল সীমানা মুক্তিযোদ্ধাদের অধীনে এসেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার ছিলেন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত এবং ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন ছিলেন রাও। উপর হতে নির্দেশ দিল যে জাফলংয়ের দিকে অগ্রসর হয় ইন্ডিয়ান এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য এবং মুক্তিযোদ্ধার কয়েক কোম্পানি মিলিত হয়ে জাফলং চা-বাগান ঘিরে ফেলে। মুক্তিযোদ্ধা ও ইন্ডিয়ান সৈন্য মিলিত হয়ে প্রায় ১৫-২০ দিন যুদ্ধ করে। যুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযোদ্ধা ও ইন্ডিয়ান বহু সৈন্য ও পাকহানাদার মারা গেছে। তখন তারা অনুমান করেছিল যে ২০-২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছে এবং ৩০ জন যুদ্ধে আহত হয়েছে। তারপর পাকহানাদার বাহিনী শালুটিকর গিয়ে পৌঁছল। তখন জাফলং মুক্তিযোদ্ধাদের আয়ত্তে। এরপর শালুটিকর থেকে গোয়াইনঘাট এসে তারা পৌঁছল।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনা অধিনায়ক নিয়াজী ৯৩ হাজার পাকসৈন্য নিয়ে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক অরোরার কাছে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করলেন। ওই দিন গোয়াইনঘাটে তিনি অস্ত্র জমা দিয়ে বিজয় পতাকা উত্তোলন করলেন এই স্বাধীন বাংলাদেশে।

সূত্র: জ-৭০২৮

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
বিজলী রানী দাশ	**মুক্তিযোদ্ধা অন্নদা চরণ দাস**
গনিনগর ষোলগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : গনিনগর, ডাক : গনিগঞ্জ বাজার
দশম শ্রেণি, রোল : ১	থানা ও জেলা : সুনামগঞ্জ
	বয়স : ৫৯

দিনটা ছিল খুবই ভয়াবহ

১৯৭১ সাল। সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমরা তখন আমাদের গ্রামের বাড়ি বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার বাঙ্গালপাড়ায় ছিলাম। মেঘনা নদীর তীরে গ্রামটি ছোট এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত।

সেদিন ছিল ১৯ মে। বাঙ্গালপাড়া গ্রামের অদূরে পাকসেনারা তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। গ্রামের কিছু লোক তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তবে তাদের প্রধান কার্যালয় ছিল বর্তমান সিলেট বিভাগের শেরপুর অঞ্চলে। মেঘনা নদীর ওপর দিয়ে আসা-যাওয়ার সময় পাকসেনারা গ্রামগুলোকে চিহ্নিত করত এবং সন্ধ্যার সময় গ্রামের মানুষের ওপর অতর্কিত হামলা চালাত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাস দুয়েকের মধ্যে পাকবাহিনী এই শান্ত গ্রামে এসে পৌঁছায় এবং নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায়। সে দিনটা ছিল খুবই ভয়াবহ। পাকসেনারা বাঙ্গালপাড়া বাজারে নেমে বাজারের অধিকাংশ দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়। অনেক মানুষকে হত্যা করে। তাদের মধ্যে একজন সুধীর দাস। বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাকে গুলি করে নদীতে ফেলে দেয়। অনেক লোককে মারতে চাইলে গ্রামের চেয়ারম্যান নূর মিয়া তাদের বাধা দেয়।

প্রাণ বাঁচানোর জন্য অনেক মানুষ নৌকা নিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ছুটে যায়। তখন কিছু ঘুষখোর লোক যাদের স্থানীয় ভাষায় দালাল বলে, তারা ভীত সন্ত্রস্ত মানুষদের টাকার বিনিময়ে ভারতের বর্ডার পার করে দিত। আমার বাবা, ঠাকুমা, দাদু এবং আমার কাকাদের নিয়ে বর্ডার পেরিয়ে যাবার সময় এক দালালকে টাকা দেয়। কিন্তু ভারতের বর্ডার পেরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তালশহর ব্রিজের নিচে রাজাকাররা লোকটিকে মেরে ফেলে। তখন রাজাকাররা আমার বাবাকে মারার জন্য নৌকা থেকে নামায়। কিন্তু আমার ঠাকুমার মিনতিতে আমার বাবাকে ছেড়ে দেয়। নৌকাটি আবার আগের উদ্দেশে চলতে লাগল। তখন নৌকা এল লাড়ুই নোয়া গ্রামে। এখানে এক সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো জায়গায় যেতে পারল না। গ্রামের বাজারে পাকসেনারা আগুন লাগিয়ে দিল। এক সপ্তাহ পর ভারতের বর্ডার পেরিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মাধবপুর গ্রামে তারা পৌঁছে। তখন আনুমানিক রাত তিনটা।

সূত্র: জ-৬৬৪৮

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
উর্মিলা দাস উর্মি	**ক্ষিতিশ দাস**
সরকারি এসসি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৫২ বছর, সম্পর্ক : বাবা
১০ম শ্রেণি, খ শাখা, রোল : ২১	

শরীফপুর গ্রামের কাল-রাত্রি

আমাদের বাড়ি হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার আহমদাবাদ ইউনিয়নের শরীফপুর গ্রামে। ১৯৭১ সালে এটি তিন নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ গ্রামে এসে রাজার বাজার হাই স্কুলে (বর্তমান রাজার বাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। প্রথমে তারা তেমন ক্ষতি না করলেও পরে তাদের অত্যাচার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। তবে গ্রামে প্রথম থেকেই রাজাকারদের তৎপরতা ছিল। স্থানীয় রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সহযোগিতায় পাকিস্তানি বাহিনী তাদের নির্মম বর্বরতা শুরু করে। ১৯৭১ সালের সম্ভবত ২২ মে ভোর চারটায় তারা হামলা শুরু করে। এই হামলার নেতৃত্বে ছিল পাকিস্তানি বেলুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন ইউসুফ খান। প্রথমেই তারা আমাদের গ্রামের পাল বাড়িতে যায় এবং কয়েকজনকে বেয়নেট চার্জ করে এবং কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায়। তারা হলেন, বীপিন চন্দ্র পাল, হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, ব্রজেন্দ্র চন্দ্র পাল, সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য, অক্ষয় শুক্ল বৈদ্য, সতীন্দ্র শুক্ল বৈদ্য, রাখাল শুক্ল বৈদ্য, টেনু শুক্ল বৈদ্য।

তাছাড়া, ওই বাড়ির দুইজন মেয়েকেও তারা বাচ্চাসহ ধরে নিয়ে দুর্গাপুর ক্যাম্পে আটকে রাখে। তারা হলো- পুষ্প শুক্ল বৈদ্য ও মালতী শুক্ল বৈদ্য। পুষ্প শুক্ল বৈদ্য ছিল রাখাল শুক্ল বৈদ্যের স্ত্রী এবং মালতী শুক্ল বৈদ্য রাখালের বড় ভাইয়ের স্ত্রী। আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম গোছাপাড়ায়ও তারা হামলা চালায়। ওই গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা সিরাজের বাড়িতে গিয়ে সিরাজকে না পেয়ে তার বাবা ও চাচাকে নির্যাতন করে ধরে নিয়ে যায়। পরে তাদের সবাইকে একত্র করে আমরোড বাজারের রাস্তা এবং আসামপাড়া রাস্তার সংযোগস্থলে রশিদ মিয়ার পুকুরের কোণে চোখ বেঁধে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তাদের মধ্যে রশিদ মিয়া (সিরাজের বাবা) ও স্টেশন মিয়া (সিরাজের চাচা) ছিলেন। তাছাড়া, তারা পালবাড়ির সব বাড়ি গান পাউডার ছিটিয়ে পুড়িয়ে দেয়। কির্তাই গ্রামে দিঘির কোণার উত্তর পাড়ে দোকানদার বাড়ি নামে পরিচিত বাড়ি হতে কাপড় ব্যবসায়ী, আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক রইছউল্লাহকে চোখ বেঁধে গাড়িতে করে নিয়ে

যায় চুনারুঘাট ক্যাম্পে। রইছ উল্লাহ ও রাখাল শুক্ল বৈদ্যের লাশ পরে আর পাওয়া যায়নি। এই সব ঘটনার নায়ক ক্যাপ্টেন ইউসুফ খান পরবর্তীতে তেলিয়াপাড়া যুদ্ধে মারা যায়।
আমার এক দাদু হাবিবুর রহমান চৌধুরীকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে আটকে রেখেছিল। ছয়চেড়ি গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল হাসিম পাকবাহিনীর সহযোগী ছিল। পালবাড়ির বংশধর বিপীন চন্দ্রের নাতি বিরেশ চন্দ্র পালকেও তারা বেয়নেট চার্জ করেছিল। সে ছোট ছিল বলে তাকে প্রাণে মারেনি। বিরেশ চন্দ্র সেই ২২ মে ভয়াল রাতের সাক্ষী। তাছাড়া আরো দুইজন সেই রাতের সাক্ষী হিসেবে আছেন। তারা হলেন পুষ্প শুক্ল বদ্য ও মালতী শুক্ল বদ্য। বর্তমানে তারা স্বামী সন্তানদের নিয়ে অতি কষ্টে জীবন যাপন করছেন।
সেই রাতের শহীদ ও বীরাঙ্গনাদের স্মৃতি রক্ষার কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

সূত্র: জ-৬৬৫০

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
নূরে জান্নাত মৌ	**মো. সিরাজুল ইসলাম**
সরকারি এসসি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৫৬ বছর, সম্পর্ক : বাবা
৯ম শ্রেণি, খ শাখা, রোল : ০২	

সোনার মতো চকচকে বাটি

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার মায়ের বয়স ছিল ১২ বছর। তখন পাকিস্তানিরা আমাদের দেশে হামলা চালিয়েছিল। তারা সারা দেশের মানুষকে নির্মমভাবে অত্যাচার করে। আমার মা যে গ্রামে বাস করতেন সেই গ্রামের নাম ছিল হাছন নগর। গ্রামে একদিন পাকিস্তানিরা ঢুকলো। তখন তাদের ভয়ে গ্রামের সবাই এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। আর আমার মা, তার মা-বাবা ভাইবোনদের সাথে পালাতে লাগলেন। গ্রামের মানুষ প্রাণের ভয়ে কেউ গর্তে, কেউ পানিতে ডুব দিয়ে থাকে। তখন আমার মা ও তার বাবা-মা, ভাই-বোনকে নিয়ে একটি গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়েন। মার মুখ থেকে শুনেছি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন একদিন তার বাবা বাড়ি থেকে কিছু দূরে সোনাখালী নামক একটি পুলের ওপর দিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন, চাল কেনার জন্য। সেই পুলের পাশে একটি দোকান ছিল, দোকানি একাই বসে ছিল। দু-একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলাচল করছিল। ঠিক তখন কোথা থেকে দুটি পাকিস্তানী বিমান গুড়গুড় আওয়াজ করে আকাশ দিয়ে আসছিল। আওয়াজ শুনে গ্রামের সব লোক যে যেদিকে পারছে পালিয়ে যাচ্ছিল। মা বলেন, তার বাবা কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। একবার ভাবেন, দোকানে ঢুকে যাবেন আবার ভাবেন না যদি তারা এটিকে বাংকার মনে করে বোমা নিক্ষেপ করে। তাই তিনি পুলের নিচে চুপচাপ বসে রইলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বিকট শব্দ শোনা গেল। আর শব্দটি ভেসে আসছিল সেই দোকান থেকে। দোকানের মালিকের বাড়ি কাছেই ছিল। তাই বোমার শব্দ শুনে তার স্ত্রী ভাবল তার স্বামী তো দোকানে ছিল, দেখি তো তার কিছু হলো নাকি। তখন সে দৌড়ে দোকানের দিকে গিয়ে দেখল সত্যিই তার স্বামী মারা গেছে। মহিলাটি কান্নাকাটি করতে লাগল তার কান্না শুনে গ্রামের সবাই দোকানের দিকে ছুটে এলো। মা বলেন, তখন তার বাবা পুলের নিচ থেকে বেরিয়ে আসেন। এসে দেখেন যে দোকানের লোকটি মারা গেছে। তিনি তখন সবাইকে বললেন যে, যদি আমি পুলের নিচে না ঢুকে দোকানে ঢুকতাম তাহলে আমিও নির্ঘাৎ মারা যেতাম।
এই ঘটনার কিছুদিন পরের ঘটনা।
গ্রামে গোলাপী বেগম নামে একজন মহিলা বাস করত। সে ছিল খুব গরিব। তার স্বামী ছিল না। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। সে বাড়ি বাড়ি কাজ করত এবং মাঝে মাঝে মাটি কাটার কাজও করত। একদিন সে হাছননগরে মাটি কাটার কাজ করছিল। হঠাৎ মাটির নিচে একটি বাটি দেখতে পেল। সোনার মতো ঝলমল করছিল। বাটিটি তুলে সে হাতে নিল এবং তার সাথের অন্যান্য মহিলা যারা কাজ করছিল তাদেরকে দেখাল। তারা এটিকে মূল্যবান কিছু মনে করে অনেকবার ওলটপালট করে খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। গোলাপী বেগম সেটি বাড়িতে নিয়ে গেল এবং সন্তানদের দেখাল। কিন্তু পাড়ার কাউকে দেখাল না। সে তার দুই সন্তানকে নিয়েই সেটি খোলার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করল। কিন্তু খুলতে পারল না। কারণ এটি কোনদিকে খুলতে হয় তার কোনো চিহ্ন ছিল না। তাই তারা একটি কুড়াল দিয়ে সেটি দু টুকরো

করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু ওটা যে একটা বোমা ছিল তা তারা বুঝতে পারেনি। তারা সত্যি সত্যিই কুড়াল দিয়ে কোপ মারল এবং সাথে সাথে বোমা বিস্ফোরিত হল এবং গোলাপী বেগম ও তার ছেলে মেয়ে দুটো প্রাণ হারালো। এমন জোরে বিস্ফোরনের শব্দ হয়েছিল যে তা শুনে আমার মা ও পাড়ার লোকেরা দৌড়ে সেই বাড়িতে গেল। গিয়ে দেখে গোলাপী বেগম ও তার সন্তানদের মৃতদেহ পড়ে আছে। তাদের মৃত্যুর খবর শুনে গোলাপী বেগমের সাথে যারা মাটি কাটার কাজ করত তারাও আসল। তারা এসে সকল ঘটনা খুলে বলল এবং কোন জায়গায় এ ঘটনা ঘটেছে তাও বলল। তারপর পাড়ার লোকেরা বলল যে হ্যাঁ, এখানে পাকিস্তানিদের বাংকার ছিল। পাকিস্তানিরা হয়তো মানুষ মারার জন্যই এই বোমাটি রেখেছিল। এভাবে পাকিস্তানিরা কত মানুষকে যে নির্মমভাবে হত্যা করেছে তার শেষ নেই।

সূত্র: জ-৭০৬০

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
তামান্না আক্তার	**রোকেয়া বেগম**
লবজান চৌধুরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	তেঘরিয়া মাঝের হাটি, স্বর্ণালী বি/৫৪, সুনামগঞ্জ
৮ম শ্রেণি	বয়স : ৪৮

কালেমা পড়ায় জীবন রক্ষা

আমাদের গ্রাম সুনামগঞ্জ জেলার মল্লিকপুর। ২৫ মার্চ রাতে পাকসেনারা ঢাকায় সাধারণ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ খবর শুনে সবার মনে কিছুটা ভয় দেখা দেয়। ২৮ মার্চ মাঝরাতে ৭ জন পাকসেনা আসে সুনামগঞ্জে। ওঠে সুনামগঞ্জের পুরানো সার্কিট হাউসে। সাথে সাথে এ খবর চলে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। পরদিন সকালেই মুক্তিযোদ্ধারা সেই সার্কিট হাউস আক্রমণ করে। ভীষণ গোলাগুলি হয় পাকসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে। সেখানে গুলিতে প্রাণ হারান একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ছিলেন আনসার। তার নামটা কী ছিল তা ঠিক মনে পড়ে না আমার বাবা। মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে তিনজন পাকসেনাও প্রাণ হারায় আর বাকি চারজন প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনার পর সুনামগঞ্জের সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের ভয় দেখা দেয়। অনেকেই গ্রাম ছেড়ে ভারতে যেতে শুরু করে। আমার বাবা, দাদা, দিদা, কাকা, পিসি সবাই চলে যান ভারতের শরণার্থী শিবিরে। কিছুদিন পর বাবা আবার চলে আসেন আমাদের গ্রামের বাড়িতে। আমাদের গরু ছিল কয়েকটি এবং গোলাভরা ধান ছিল। এমন অনেক আত্মীয়স্বজন ছিল যারা এই সবকিছুর মায়া ছেড়ে ভারতে যেতে চাননি, তাদের নিতে এসেছিলেন আমার বাবা। বাড়িতে আসার পর আর যেতে পারছিলেন না তিনি, কারণ তখন সুনামগঞ্জের প্রায় সব জায়গাতে ছিল পাকসেনাদের চেকপোস্ট। আমাদের গ্রামের চৌধুরী বাড়ির ছেলে মিহির চৌধুরীকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায় এবং তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে। যুদ্ধের পুরোটা সময় তাকে আটক করে রাখে। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন আগে মিহির চৌধুরীকে একদিন মারার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় এবং চোখ ও হাত বেঁধে লাইনে দাঁড় করায়, কিন্তু ভাগ্যের জোরে তিনি বেঁচে যান। কারণ আমাদের গ্রামের এক লোক পাকসেনাদের ক্যাম্পে কাজকর্ম করত, তার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল মিহির চৌধুরীর। সে পাকসেনাদেরকে অনেক বলে কয়ে বাঁচিয়ে দেয়। এই করে দেশ স্বাধীন হওয়ার সাত দিন পর তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন।

যা হোক, বাবা আরো কিছু সঙ্গীর সাথে ভারতে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন। সুনামগঞ্জ বাজারে গিয়ে সাববাড়ি নামক এক খেয়াঘাট দিয়ে নদী পার হয়ে বেরিগ্রাম দিয়ে তারা বর্ডার পার হবেন এবং ভারতে প্রবেশ করবেন। বাড়ি থেকে সুনামগঞ্জ বাজারে যেতে পথে একটি ব্রিজ আছে, সেই ব্রিজের পাশে পাকসেনাদের বাংকার আছে। আমার বাবা এবং অন্যরা তা জানতেন। কিন্তু জেনেও তারা ওই পথেই রওনা হলেন। কারণ তখন ছিল বর্ষাকাল। চারদিকে পানি। বাজারে যাওয়ার এটাই ছিল একমাত্র রাস্তা। তারা যখন ব্রিজের কাছে গেলেন তখন ১২জন পাকসেনা এসে তাদের পথ আটকে দাঁড়ায় এবং জিজ্ঞাসা করে তারা কোথায় যাবে এবং তারা হিন্দু না মুসলমান। প্রাণভয়ে তারা তখন মিথ্যা কথা বলেন। কিন্তু তারা হিন্দু হয়েও বলেন যে, আমরা

মুসলমান। বাবা এবং অন্যদের পাকসেনারা কালেমা পড়তে বলে। ভাগ্য ভালো তাদের কালিমা জানা ছিল। তাই তারা কালেমা বলতে পারেন। পরে তাদের সবাইকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে পিঠে একটা করে বাড়ি দিয়ে ছেড়ে দেয়। এরপর তারা খুব কষ্টে ভারত যেতে পারেন। সেখানে গিয়ে বাবা দেখলেন আরো কত মর্মান্তিক দৃশ্য। শরণার্থী শিবিরে মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। কত তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ এবং শিশু কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে তার হিসেব নেই। কত লাশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে পশুপাখি। তারপর যখন দেশ স্বাধীন হলো বাবা, দাদা সবাই দেশের মাটিতে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন যে বাড়িঘরের অবস্থা খুবই খারাপ। শহরে সব পরিত্যক্ত বাড়ির অবস্থা ছিল ধ্বংস প্রায় এবং লুটপাট দ্বারা জিনিসপত্রশুন্য।
সুনামগঞ্জের পিটিআই স্কুলে ছিল পাকসেনাদের মেইন ঘাঁটি। তাই যুদ্ধের পর এখানে অনেক নারী-পুরুষ এবং শিশুদের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এগুলোই ছিল আমার বাবার মুখে শোনা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মর্মান্তিক কাহিনি।

সূত্র: জ-৭০৭৬

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
সিমা রানী দাশ	**আনন্দ মোহন দাশ**
লবজান চৌধুরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	বয়স : ৫০
১০ম শ্রেণি, রোল : ৬	সম্পর্ক : পিতা

রঙিন জামা কিনে দিতে হবে

আনুমানিক ভাদ্র মাসের দুই তারিখ। আমাদের শ্রদ্ধেয় পুরোহিত বিদু চক্রবর্তী সপরিবারে ভারতের বালাহাটে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে যাত্রা করেন। জামালগঞ্জের কাছে চানবাড়ির খালে রাজাকাররা তাদের দেখে ফেলে এবং নৌকা লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। গুলিতে নৌকার সামনের অংশ ভেঙে যায়। ভাঙা নৌকা নিয়ে তারা রণারচর গ্রামে ফিরে আসেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে সাফল্য বাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেন। মাসখানেক তারা ভালোই ছিলেন। কার্তিক মাসের ১৬ তারিখ পাঞ্জাবি ও রাজাকার বাহিনী রণারচর গ্রামে আক্রমণ করে এবং বিদু চক্রবর্তীকে ধরে ফেলে। তাকে তারা হাত-পা বেঁধে নির্যাতন করে। পাশাপাশি তার মা-বাবা, ভাই-বোনকে গুলি করে হত্যা করে। চক্রবর্তী মহাশয় মৃতপ্রায় হয়ে মাটিতে পড়ে থাকেন। তখন পাঞ্জাবি ও রাজাকাররা গ্রামে মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশের পক্ষের লোককে খুঁজতে থাকে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে চক্রবর্তী মহাশয় হাত বাঁধা অবস্থায় জঙ্গলে পালিয়ে আশ্রয় নেন।
হানাদার বাহিনী গ্রাম থেকে বিদায় নেওয়ার পর চক্রবর্তীরা মা ও ভাইবোনকে দেখার জন্য ছুটে আসেন। তিন তিনটি লাশ জড়িয়ে ধরে তিনি তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। সে সময় মুক্তিবাহিনীর একটি পেট্রল দল আসে। দলের কমান্ডার সুধির কুমার দাশ ও নজরুল ইসলাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে লাশ সৎকার করে দ্রুত এই জায়গা ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি স্থানীয় ব্যক্তি সাফল্য দাশ ও দুর্যধন দাশকে নিয়ে লাশ তিনটি সৎকার করেন।
বালাহাট যাওয়ার পথে একমাত্র বোন বলেছিল, বাজারে পৌঁছে আমাকে একটি সুন্দর রঙিন জামা কিনে দিতে হবে। এই কথাটি চক্রবর্তী মহাশয়কে আজীবন পীড়া দিচ্ছে।

সূত্র: জ-৭১৪৬

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
পান্না রানী দাস	**বিদু চক্রবর্তী**
রাজানগর কেসিপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম : সিরারচর, ডাক : হরনগর
	উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ
	বয়স : ৬০

রুকুম আলীর বেঁচে ফেরা

১৯৭১ সাল। আনুমানিক শ্রাবণ মাসের পাঁচ তারিখ হবে। রুকুম আলী ও তার সঙ্গে ১০ জন যুবক মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য রণারচর হতে ভোরে রওয়ানা হলেন। তাদের দলে ছিলেন, ১. রুকুম আলী, রণারচর, ২. আব্দুর রহমান, রণারচর, ৩. আব্দুল জব্বার, রণারচর, ৪. আব্দুস শহিদ, রণারচর, ৫. নুর, রণারচর, ৫. হাসন আলী, রণারচর, ৭. সুমন মিয়া, জাহানপুর, ৮. তাজুউলা, জাহানপুর, ৯. তারিফউলা, দাইকুর, ১০. প্রমুদ দাস, আলীপুর।

বিকাল চারটায় সুকাইর হাওর থেকে বেলী মালঘাট রাধানগরের হিজল বাগিচায় যাওয়ার পর হঠাৎ তারা হানাদারবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। সেখান থেকে তাদের সবাইকে বাজারে নিয়ে কিছুক্ষণ রাখার পর জামালগঞ্জ থানায় নিয়ে লকআপে রাখা হয়। পরদিন সকালে হানাদাররা তাদেরকে নির্মমভাবে মারপিট করে। পরে সুনামগঞ্জ ডাকবাংলোয় নিয়ে যায়। সেখানে আরেকজন লোক আটক ছিল। রাতের বেলা তাদের জানালার রডের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাখে। পরদিন আরেকজন লোক ধরে আনে। তখন তারা বারো জন লোক বন্দি অবস্থায় থাকে। তার পরদিন বিকাল পাঁচটার দিকে তাদেরকে অন্য রুমে নিয়ে যায়। ১২ জনকে বেঁধে একজনের হাতের সঙ্গে অন্যজনকে জোট করে। এভাবে সবাইকে একজোট করে কিছুক্ষণ রাখে। পরে আবার চারজন মিলে এক জোট করে, এইভাবে তিন জোট তৈরী করে। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে নয়জন পাঞ্জাবি সৈন্য তাদের নিয়ে রওনা হয়। পথে হাঁটিয়ে নিয়ে টুকের খাট নদীর অপর পারে অতপুর নদী ও খালের সংযোগস্থলে তিন জোট মানুষ তিন খালে রাখে। পরে দুইজন করে জোড়া করে নদীর পাড়ে বসিয়ে বুকের মধ্যে রাইফেল ধরে গুলি করে। এইভাবে পাঁচ জোড়া গুলি করে মেরে ফেলে। শেষ জোড়ার রুকুম আলী ও আব্দুর রহমান ছিলেন। নদীর পাড়ে যখন তাদের বসায় তখন আব্দুর রহমান আগেই বসে যান, কিন্তু রুকুম আলী দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজন আব্দুর রহমানের বুকে রাইফেল ধরে আছে আরেকজন রকুম আলীকে বসানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু রুকুম আলী বসলেন না। এর ভেতরে আব্দুর রহমানের বুকে গুলি চালিয়ে দেয়। গুলি চালানোর সাথে সাথে রুকুম আলীও মা বলে হাত বাঁধা অবস্থায় নদীতে পড়ে যায়। পানির গভীরে যাওয়ার পর দেখলেন যে তার হাতে বাঁধন নেই। প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তিনি ভেসে উঠলেন এবং সাঁতারে তিনি মাঝ নদী বরাবর চলে গেলেন। তখন হানাদাররা তার ওপর গুলি ছুড়ে, কিন্তু আল্লাহর দয়ায় তার গুলি লাগেনি। এইভাবে সাঁতরিয়ে টুকের খাট মুচিবাড়ির ঘাটে পৌঁছেন এবং অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকেন। মুচি তাকে তুলে এক মুসলমান বাড়িতে নিয়ে যায় এবং সুস্থ করে তোলে। অতঃপর তাকে ইনাতনগর যাওয়ার জন্য রাস্তা দেখিয়ে দেয়। অন্ধকার রাতে তিনি খুব কষ্ট করে ইনাতনগর গিয়ে এক বাড়িতে আশ্রয় নেন। আশ্রয়দাতাকে রুকুম আলী ধর্মপিতা বলে ডাকেন। তিনি তাকে মুকদপুর জনাউল্লার বাড়িতে পাঠান। সেখান থেকে ভাটিপাড়া বাজারে যান। দুর্মরা নামে একজন লোক তাকে তার বাড়ি রণারচর নিয়ে আসেন। এই গরিব লোকটি এখনও বেঁচে আছেন।

সূত্র: জ-৭১৪৮

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
পংকজ কান্দি দাশ	**মো. রুকুম আলী**
রাজানগর কেসিপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম : রণারচর, ডাকঘর : হরনগর
নবম শ্রেণি, রোল : ১	উপজেলা : দিরাই, জেলা : সুনামগঞ্জ
	বয়স : ৬০

রামচন্দ্রের আত্মত্যাগ

আমার দাদু রামচন্দ্র দেবনাথ একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও সাহসী মানুষ। তিনি যুদ্ধ করেননি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা। তিনি বললেন, ১৯৭১ সালে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার, বাসস্থান, তথ্য ইত্যাদি দিয়ে তিনি সাহায্য করেছেন। রাতে তার বাড়িতে অনেক মুক্তিযোদ্ধা থাকতেন। একদিন রাজাকাররা পাকবাহিনীকে এই মর্মে সংবাদ দেয় যে, রামচন্দ্র দেবনাথের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান করছে। এই খবর পেয়ে পাকবাহিনী দ্রুত রামচন্দ্রের বাড়িতে অভিযান চালায়।

রামচন্দ্র দেবনাথের স্কুলের দয়াময় নামে এক ছাত্র ছুটতে ছুটতে তার বাড়িতে এসে খবর দেয় যে, আপনার বাড়িতে পাকবাহিনী আসছে। এই খবর শুনে তিনি তার বাড়িতে থাকা ২৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে দেন। তার বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে না পেয়ে হানাদারবাহিনী রামচন্দ্রকে তাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে দুই দিন উপোস থাকতে হয় তাকে। এরপর তিনি ভাগ্যক্রমে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন।

এই ঘটনার পর মুক্তিযোদ্ধারা রামচন্দ্রের বাড়িতে আর আসা-যাওয়া করত না। ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতীয় সীমান্তে রেখে আসেন। যা তার বাড়ি থেকে ২৫ মাইলেরও বেশি দূরে ছিল। সেদিনের ঘটনার পরও পাকবাহিনী হাল ছাড়েনি। তারা একবার দুইবার নয় বারবার রামচন্দ্র দেবনাথের বাড়িতে আসে, তাকে ধরার জন্য। কিন্তু তাকে ধরতে পারেনি। একদিন রামচন্দ্র দেবনাথকে না পেয়ে পাকবাহিনী তার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তিনি তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার জন্য তার শ্যালক কৃষ্ণচন্দ্র দেবনাথকে দিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেন এবং একা দেশে থাকেন।

১৯৭১ সালের ১৪ অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্যাদি ও খাবার দিয়ে ফিরে আসার সময় পাকহানাদাররা তাকে দেখে ফেলে এবং গুলি ছুঁড়ে। তখন একটি গুলি এসে তার পেটে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্ঞান হারান। তার পরিচিত কয়েকজন তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তার এবং নার্সের অভাব থাকার কারণে প্রায় দুই মাস লেগে যায় তার সুস্থ হতে। এরই মধ্যে তিনি খবর পান যে, শ্যালক কৃষ্ণচন্দ্র দেবনাথ ভারত থেকে ফিরে আসার পর পাকবাহিনী তাকে হত্যা করেছে। তিনি খুবই কষ্ট পান ও শোকাহত হন। তার মাথায় তখন চিন্তা আসে যে, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ভালো আছে কি? তাই তিনি লুকিয়ে আবার ভারত যান। সেখানে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সাথে দেখা করে দেশে ফিরে আসেন। ভারত থেকে এসে শুনলেন যে, তার বন্ধু গোবিন্দ পালকে পাকবাহিনী মেরে ফেলেছে এবং তার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। তিনি আরো শুনলেন যে, অতি শীঘ্রই তাকেও ধরার জন্য পাকবাহিনী আসতে পারে। এ কথা শুনে রামচন্দ্র দেবনাথ সাবধান হয়ে গেলেন। তিনি বাজারে রেডিওতে শুনলেন যে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের প্রায় সবকটি জায়গা পাকবাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করেছে। অবশেষে এলো ১৬ ডিসেম্বর। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল। পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। দেশ স্বাধীন হওয়াতে রামচন্দ্র দেবনাথ অনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন। ১৯৭২ সালের চার জানুয়ারি রামচন্দ্র দেবনাথ ভারত যান। সেখান থেকে তিনি তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের দেশে নিয়ে আসেন। বর্তমানে তিনি তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছেন।

সূত্র: জ- ৬৭০০

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
সৃজন দেবনাথ	**রামচন্দ্র দেবনাথ**
সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : আদুখালী, ইউনিয়ন : পলাশ
৮ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ৫৫	ডাক ও থানা : সুনামগঞ্জ,
	বয়স : ৮৬, সম্পর্ক : দাদু

মা অজ্ঞান হয়ে গেলেন

ভৈরব জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম চাপলপাড়। তখন ১৯৭১ সাল। দেশে চলছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধের সাক্ষী হচ্ছেন আমার মা। তখন তার বয়স ছিল ১০ কি ১২ বছর। বাড়ির পাশেই ছিল গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেখানে ঘাঁটি গেঁড়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। সেদিন ছিল রবিবার। দুপুরের আগ মুহূর্তে সবাই গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছিল। আর সেই দলে ছিলেন আমার মা এবং তার পরিবারের অন্য সদস্যরা। এত লোকের ভিড়ের মাঝে মা হঠাৎ দলছাড়া হয়ে গেলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির পথে রওনা হলেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ দিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ গুলির শব্দ পেয়ে বিদ্যালয়ের বড় ছাতিম গাছের নিচে লুকিয়ে পড়লেন।

সেখান থেকে তিনি দেখলেন বিদ্যায়ের মাঠে সারিবদ্ধভাবে যারা দাঁড়িয়ে আছে ১০-১২ জন লোক তারা সবাই গ্রামের পরিচিত । তাদের চোখ ও হাত বাঁধা। তাদের দিকে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকজন

হানাদার সৈন্য। তারা সেখান থেকে একজন করে ডেকে এনে গুলি করে হত্যা করছিল। এ ভয়ংকর দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে মা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ভিড়ের মধ্যে আমার দাদু লক্ষ করলেন মাকে আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তাকে সবাই মিলে খুঁজতে শুরু করল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দাদু মাকে অজ্ঞান অবস্থায় ছাতিম গাছের নিচে খুঁজে পান।
সেই ভয়ংকর দৃশ্য মাকে এখনও পীড়া দেয়।

সূত্র: জ- ৬৭০৪

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মিথুন রায়	**করুণা রানী রায়**
সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৪৫, সম্পর্ক : মা
৮ম শ্রেণি, খ শাখা, রোল : ৪৫	

মারাত্মকভাবে আহত হই

সেদিন ছিল ২৮ মার্চ, ১৯৭১ সাল। আমরা আমার বড় ভাই মারদার আলীর নেতৃত্বে আনসার এডজুটেন্টের কাছ থেকে ৫০টি রাইফেল নিয়ে পুরাতন কলেজের অভ্যন্তরে (বর্তমান ট্রাফিক পয়েন্ট) উৎসাহী মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছু ছেলেদের মাঝে সেগুলো বিতরণ করি। এমন সময় ক্যাপ্টেন মাহবুব ১১ জন পাকবাহিনীর নিয়মিত সৈন্য নিয়ে অতি সন্তর্পণে সুনামগঞ্জ থানায় গিয়ে ওঠে এবং রাত আটটার দিকে সমস্ত সুনামগঞ্জে সান্ধ্য আইন জারির ঘোষণা দেয়। তখন আমরা ওয়েজখালী গ্রামে চলে যাই এবং সেখানে রাস্তার ধারে সারারাত ধরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলি। পরদিন সকালে সুনামগঞ্জ থানার দিকে ধাবিত হয়ে আমিই প্রথমে একটি গুলি ছুঁড়ি। সাথে সাথে ছাত্র-জনতার মিছিল সার্কিট হাউসের দিকে ধাবিত হলে পাকবাহিনী গুলি ছুড়ে মিছিল প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। তাদের গুলিতে রিকশাচালক গনেশ দাশ গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। আমরাও পাল্টা গুলি ছুড়ি এবং উভয় পক্ষের গোলাগুলির এক পর্যায়ে আনসার কমান্ডার আবুল হোসেন সতীশচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শাহাদাৎ বরণ করেন। রাতে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অতি গোপনে ক্যাপ্টেন মাহাবুব শুধু তিনজন সঙ্গী রেখে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরদিন মুক্তিযোদ্ধা ও বিক্ষুব্ধ ছাত্রজনতার হাতে তিনজনই মারা যায়। তুমুল যুদ্ধে ইপিআর-এর একজন শহীদ হন।
মে মাসের প্রথম দিকে পাক জঙ্গিবিমান হামলা চালায় সুনামগঞ্জ শহরে। তখন সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় আমরা ওই স্থান ত্যাগ করে ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন অফিস হয়ে ভারতীয় সীমান্ত লালপানিতে গিয়ে পৌঁছি। ওই দিন দিবাগত রাতে আমি, জসিম, কামাল, মারদার আলী, তারা মিয়া এবং আরো অনেক সাথী নিয়ে একটি অপারেশনে রওনা হওয়ার সময় শরণার্থী আশ্রয় শিবিরে কর্মরত দেওয়ান মহসিন রাজা গংয়ের কাছে থেকে রাতের খাবার সংগ্রহ করি। রাতের অন্ধকারে ইব্রাহিমপুরে পৌঁছে আমরা পাঞ্জাবিদের উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়ি। গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা আবার যথাস্থানে ফিরে যাই। পরে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিবিগাঁও এলাকার পাকসেনাদের আক্রমণ করি। এতে অরবিন্দু, কবিন্দ্র, ও নস্কর শহীদ হয়। এর কয়েকদিন পর আমরা ষোলঘরে পুনরায় আক্রমণ চালাই। সেখানে আমাদের বীর সেনানি হাবিলদার রহিম বক্স, হাবিলদার মদন, মজলিশ মিয়া ও ধনু মিয়া শহীদ হন। পরবর্তী পর্যায়ে জাহাঙ্গীরনগরে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে ছাত্রলীগ নেতা আবু তালেবসহ আরো তিনজনকে তারা ধরে নিয়ে যায়। তাদেরকে উদ্ধারের জন্য গুলি ছোড়ার প্রস্তুতি নিতেই আমি ধৃত হই। কিন্তু সুকৌশলে হাতাহাতি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে আমার গুলিতে একজন পাকসেনা মারা যায়। তখন আমি শত্রুর অস্ত্র ছিনিয়ে নিই। তারা আমার উদ্দেশ্যে গুলি চালালে ৩১ অক্টোবর আমি মারাত্মকভাবে আহত হই।

সূত্র: জ- ৬৭১৫

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
শাহেদ আমমেদ	**আব্দুল হাসিম**
সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়	পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, সুনামগঞ্জ
৮ম শ্রেণি, খ শাখা, রোল : ০৮	বয়স : ৬০, সম্পর্ক : দাদা

নির্যাতনের বিনিময়ে ইজ্জত রক্ষা

আমি মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনার জন্য আমার এক দাদার কাছে যাই। তিনি সরাসরি যুদ্ধ না করলেও পাকবাহিনীর হাত থেকে অনেক মানুষের জীবন বাঁচিয়েছিলেন। আমি তার কাছে মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি আমাকে ওই সময়ের কয়েকটা ঘটনা বলেন। তা থেকে আমি একটি ঘটনা লিখছি।

দিনটি ছিল মে মাসের মাঝামাঝি। তখন তাদের এলাকার ঘরবাড়িতে কোনো মহিলা ছিল না। পাকিস্তানিদের ভয়ে মহিলারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু দাদার পাশের বাসার মহিলারা অন্য গ্রামে না গিয়ে তাদের ঘরেই ছিল। এদের মধ্যে দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া একটি মেয়েও ছিল। দাদার বাসায় দাদা একা ছিলেন এবং সাথে ছিল পালিত একটি ছেলে শুকুর আলী। তার পাশের বাসার মহিলারা হঠাৎ দূরে দুইজন মিলিটারি দেখতে পায়। তারা ভয় পেয়ে দাদার বাসার একটা ঘরে ঢুকে আশ্রয় নেয়।

আমার দাদার বাসাটি ছিল অনেক বড়। তিনি তখন বসে বসে একটা বই পড়ছিলেন। মিলিটারি দুইজন এসে দাদাকে জিজ্ঞাসা করল, কোনো মেয়ে কি আপনার বাড়িতে এসেছে? তখন তিনি জানতেন না যে, মহিলারা উনার বাসায় আশ্রয় নিয়েছে। দাদা বললেন, না এই বাড়িতে কেউ আসেনি। কিন্তু মিলিটারি দুজন দাদার কথা বিশ্বাস করল না। তারা দাদার দিকে বন্দুক তুলে অনেক প্রশ্ন করছিল এবং তাদের কথাবার্তা হচ্ছিল উর্দুতে। ঠিক ওই সময় বাসায় দাদার একজন পরিচিত এক লোক আসে এবং মিলিটারিদের সাথে কথা বলা শুরু করে। কথা বলার এক ফাঁকে দাদা মিলিটারিদের কাছ থেকে সরে গিয়ে দেখতে পান যে সত্যিই দুই-তিনজন মহিলা তার একটি ঘরে ঢুকে ভেতর দিকে দরজা লাগিয়ে রেখেছে। দাদা তাদেরকে দরজা খুলতে বললেন এবং সাহস করে বাসার পেছন দিকে একটু দূরে ঝোপের মতো একটা মরিচ ক্ষেতে গিয়ে শুয়ে থাকতে বললেন।

মহিলারা ঘরের পেছনের দরজা খুলে সেখানে কয়েক ঘণ্টা ছিলেন। ওদিকে পাকিস্তানিরা বুঝতে পারল যে দাদা মহিলাদের লুকিয়ে রেখেছেন। সেজন্য তারা দাদাকে অনেক প্রশ্ন করল এবং সারা বাড়ি খুঁজল। কিন্তু মহিলাদের না পেয়ে দাদা শুকুর আলী ও পরিচিত ভদ্রলোককে পাকিস্তানিরা অনেক নির্যাতন করে। কিন্তু তারা কেউ এ বিষয়ে মুখ খুলেননি। দাদাকে নির্যাতন করেও তারা মেয়েদের খোঁজ নিতে পারেনি। পরে পাকিস্তানি মিলিটারিরা চলে যাওয়ার পর দাদা তার শরীরের ওই অবস্থা নিয়েই জঙ্গলে গিয়ে মেয়েদের এনে রাতে ওদেরকে গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। ওই দিনের নির্যাতনের ফল দাদা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তারপরও তার সান্ত্বনা যে নিজে মিলিটারির অত্যাচার সহ্য করার ফলে কয়েকজন মহিলার ইজ্জত ও জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

দাদা আমাকে উনার বাসা থেকে আসার সময় দুটো বই দেন যেন আমি মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে ভালো করে জানতে পারি। বই দুটিতে ওই সময়ের অনেক ছবি আছে, যা দেখে বোঝা যায় কত লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছে।

সূত্র: জ-৬৬৪৩

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
ফারজিয়া হক ফারিন	**এ. আর জাহিরুল হাসান**
সৃজন বিদ্যাপীঠ	হাসন নগর, সুনামগঞ্জ
৫ম শ্রেণি, রোল : ০১	বয়স : ৬৩ বছর, সম্পর্ক : দাদা